

আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী

আমপারা ও সপ্ত সূরা



আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী

আমপারা ও সপ্ত সূরা

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী
আমপারা ও সপ্ত সূরা
শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ২২২২২১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

E-mail : info@quantummethod.org.bd

Website : quantummethod.org.bd

প্রথম প্রকাশ : রমজান, ২০১৩

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত মুদ্রণ : রমজান, ২০২২

মুদ্রাকর

প্রজ্ঞাপ্রকাশ

ইসলাম ভবন, ৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড
ঢাকা-১০০০

হাদিয়া

৪০ টাকা

ISBN 978-984-34-4538-4

মুক্তমনে সত্য জানতে আগ্রহী
নতুন প্রজন্মকে

কৃতজ্ঞতা

কোরআনের মর্মার্থ অনুধাবনে আল্লামা মোহাম্মদ মারমাডিউক পিকথল, আল্লামা আবদুলাহ ইউসুফ আলী, আল্লামা মোহাম্মদ আসাদ, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, আল্লামা আশরাফ আলী থানভী, আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ শফী, আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম প্রমুখ মুফাসসির-এর তফসির আমাদেরকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

কোয়ান্টাম প্রকাশিত কোরআনের সংকলন

- আল কোরআন ৥ মূল আরবি ও বাংলা মর্মবাণী
- আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী (বোর্ড বাঁধাই)
- আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী (পেপারব্যাক)

সূচিপত্র/ আমপারা

৭৮. সূরা নাবা	৪৯	৯৭. সূরা কদর	৮৮
৭৯. সূরা নাজিয়াত	৫২	৯৮. সূরা বাইয়েনাহ	৮৯
৮০. সূরা আবাসা	৫৫	৯৯. সূরা জিলজাল	৯১
৮১. সূরা তাকভির	৫৭	১০০. সূরা আদিয়াত	৯২
৮২. সূরা ইনফিতার	৫৯	১০১. সূরা ক্বারিয়াহ	৯৩
৮৩. সূরা মুতাফ্ফিফিন	৬১	১০২. সূরা তাকাসুর	৯৪
৮৪. সূরা ইনশিকাক	৬৪	১০৩. সূরা আসর	৯৫
৮৫. সূরা বুরাজ	৬৬	১০৪. সূরা হুমাজাহ	৯৬
৮৬. সূরা তারেক	৬৮	১০৫. সূরা ফীল	৯৭
৮৭. সূরা আ'লা	৭০	১০৬. সূরা কোরাইশ	৯৮
৮৮. সূরা গাশিয়াহ	৭২	১০৭. সূরা মাউন	৯৯
৮৯. সূরা ফজর	৭৪	১০৮. সূরা কাওসার	১০০
৯০. সূরা বালাদ	৭৭	১০৯. সূরা কাফিরুন	১০১
৯১. সূরা শামস	৭৯	১১০. সূরা নসর	১০২
৯২. সূরা লাইল	৮১	১১১. সূরা লাহাব	১০৩
৯৩. সূরা দোহা	৮৩	১১২. সূরা ইখলাস	১০৪
৯৪. সূরা ইনশিরাহ	৮৪	১১৩. সূরা ফালাক	১০৫
৯৫. সূরা ত্বীন	৮৫	১১৪. সূরা নাস	১০৬
৯৬. সূরা আলাক	৮৬		

সূচিপত্র/ সপ্ত সূরা

৩১. সূরা লোকমান	১০৯	৫৫. সূরা আর রাহমান	১৪০
৩৬. সূরা ইয়া-সীন	১১৬	৫৬. সূরা ওয়াকিয়া	১৪৭
৪৮. সূরা ফাতাহ	১২৭	৬৭. সূরা মূলক	১৫৪
৪৯. সূরা হুজুরাত	১৩৫		

কোরআন : সংরক্ষণ ও বিশুদ্ধতায় অনন্য ১৪
কেন বিশ্বাস করব? ২৬

আল কোরআন হোক সবসময়ের সঙ্গী



<https://alQuran.org.bd>

মর্মবাণীর ফ্রি মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
বাংলা এবং আরবিতে পড়া ও শোনার পাশাপাশি
থাকছে শব্দ বা আয়াত দিয়ে সার্চ করার সুযোগ।

মুক্ত জীবনের পথে

কোরআন পড়েছি বহুবার। কিন্তু তেমন কিছুই বুঝি নি, ভেতরে ডুব দিতে পারি নি কখনো। যখন এক নীরব মুহূর্তে কোরআনের গভীরে ডুবে গেলাম, আয়াতগুলো যেন কথা বলতে শুরু করল। শিহরিত, চমকিত হলাম। এক জীবনে যা চাই, তার সবই সাজানো রয়েছে কোরআনের পরতে পরতে। সুস্থ সুন্দর সুখী পরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে যা প্রয়োজন, পাতায় পাতায় রয়েছে তারই দিক-নির্দেশনা।

সবকিছু মিলিয়েই জীবন। তাই সমস্যা শরীরের হোক বা মনের, যৌন জীবনের জট হোক বা অর্থনৈতিক জটিলতা, পণ্যের আসক্তি হোক বা প্রবৃত্তির দাসত্ব, ব্যক্তির অসততা হোক বা সামাজিক অবিচার, পার্থিব সুখ হোক অথবা পরকালীন পরিত্রাণ, সব একই সূত্রে গাঁথা। একটাকে আরেকটা থেকে আলাদা করা যায় না। কোরআন এই চিরায়ত সত্যকেই প্রকাশ করেছে সুস্পষ্টভাবে।

‘পড়ো! তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিষিক্ত ডিম্ব থেকে। পড়ো! তোমার

মুক্ত জীবনের পথে

প্রতিপালক মহান দয়ালু। তিনি মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন কলমের। আর মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।’ সূরা আলাক-এর এই পঙক্তিমালা দিয়েই কোরআন নাজিলের সূচনা।

গুরুত্বের সাথে কোরআন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে পড়তে ও জানতে। কোরআন অজ্ঞতাকে অভিহিত করেছে মহাপাপ রূপে। মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে জ্ঞানের পথে, মুক্তবুদ্ধির পথে। এমনকি বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছার জন্যেও মানুষের সহজাত বিচারবুদ্ধির প্রয়োগকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে কোরআন। বৈষয়িক ও আত্মিক জীবনকেও একই সূত্রে গেঁথেছে কোরআন। সুস্পষ্টভাবেই বলেছে, আল্লাহর বিধান অনুসরণ করো। দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি সম্মানিত হবে।

কোরআনের প্রথম আয়াত নাজিলের ২৩ তম বছরে নাজিল হওয়া সূরা বাকারার ২৮১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা সেই দিন সম্পর্কে সচেতন হও, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে এবং তারপর প্রত্যেককেই তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে। কারো ওপর কোনো অন্যায় করা হবে না।’ প্রথম পঙক্তিমালায় যেভাবে মানুষের জন্ম প্রক্রিয়ার নিরহংকার অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে, শেষদিকের পঙক্তিমালায় একইভাবে বলা হয়েছে, কর্মের স্বাধীনতা দেয়া হলেও

মুক্ত জীবনের পথে

মানুষ জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নয়। তার কর্মের যথাযথ ফল সে পাবে।

কোরআনের প্রথম আয়াত নাজিল হয় ৬১০ সালে আর শেষ আয়াত ৬৩২ সালে। ধাপে ধাপে খণ্ডে খণ্ডে দীর্ঘ ২৩ বছরে পরিপূর্ণতা পায় কোরআন। প্রথম আয়াত নাজিল হওয়ার পরই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এর আকর্ষণী ক্ষমতা। অবিদ্যা বা জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষগুলো আলোর সন্ধান পায়। সেই আলোয় বদলাতে শুরু করে তারা।

পিতৃপুরুষের হাজার বছরের সংস্কার ও ধর্মান্ধতার বৃত্ত ভেঙে তারা লাভ করে মুক্ত বিশ্বাস ও সঠিক জীবনদৃষ্টি। এরপর নিজের মুক্তির জন্যে, মানুষের মুক্তির জন্যে কোনো ত্যাগ স্বীকারেই পিছপা হয় নি তারা। অবিদ্যা হিংসা সন্ত্রাস রক্তপাত শোষণ জুলুম আর নারীনির্যাতনে নিমজ্জিত মানুষেরাই পরিণত হয় সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীকে। দলীয়, গোত্রীয় ও উপজাতীয় হানাহানিতে লিপ্ত বিক্ষিপ্ত সম্প্রদায়গুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিণত হয় এক দুর্দমনীয় আদর্শিক জাতিসত্তায়।

প্রথম আয়াত নাজিল হওয়ার ৫০ বছরের মধ্যে কোরআনের অনুসারীরা তদানীন্তন পরাশক্তি রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যকে নিশ্চিহ্ন করে পরিণত হয় তখনকার একমাত্র পরাশক্তিতে।

মুক্ত জীবনের পথে

ইতিহাস সাক্ষী! কোরআন ছাড়া আর কোনো গ্রন্থই প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের হৃদয়ে এত আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি, এত দ্রুত মানুষকে এমনভাবে বদলে দিতে পারে নি। কোরআন সরাসরি যাদের সামনে নাজিল হয়েছিল তারাই শুধু আলোকিত হন নি; ধর্মাত্মতা ও পাশবিকতার পরিবর্তে ধর্ম, মানবিকতা ও মুক্তবুদ্ধির এই স্রোত প্রবাহিত হয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্মে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। ধর্ম, মানবিকতা ও মুক্তবুদ্ধির এই স্রোত ইতিহাসের মধ্যযুগে সৃষ্টি করেছিল এক আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা।

কোরআনের অনুসারীরা যখন শিল্প সাহিত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় অবগাহন করছিল তখন ইউরোপ ডুবে ছিল অজ্ঞতা ও ধর্মাত্মতার অন্ধকার যুগে। প্রাচ্যের এই আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা থেকেই ইউরোপের দেশে দেশে কোরআনের মানবিকতা ও মুক্তবুদ্ধির বাণী পৌছাতে থাকে বিভিন্নভাবে। ইউরোপে সূচনা হয় রেনেসাঁ বা মুক্তবুদ্ধির জাগরণ। নতুনভাবে শুরু হয় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা। এগোতে থাকে বিজ্ঞান। তাই নিঃসংশয়ে বলা যায়, কোরআন যে মানবিকতা জ্ঞানচর্চা ও মুক্তবুদ্ধির শিক্ষা দিয়েছে, তারই ফলস্বরূপ লালিত হয়ে বিশ্ব প্রবেশ করেছে বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুগে।

মুক্ত জীবনের পথে

প্রতিটি মানুষ বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই একটি মৌলিক প্রশ্নের জবাব জানতে চায়। তা হলো, দুনিয়ায় আমি কীভাবে ভালো থাকব? মৃত্যুর পর কোনো জীবন আছে কি? থাকলে সেখানে কীভাবে ভালো থাকব? চৌদ্দ শ বছর ধরে কোরআন থেকে যত বেশি সংখ্যক মানুষ এই প্রশ্নের বোধগম্য জবাব পেয়েছে, আর কোনো গ্রন্থ থেকে সে তা পায় নি। কোরআন তাই কোটি কোটি মানুষের কাছে অনুভূত হয়েছে পরম করুণাময়ের করুণার এক উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে।

কোরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম। নাজিল হয়েছে আরবি ভাষায়। এর শব্দবিন্যাস, এর ছন্দ, এর সৌন্দর্য, এর ব্যঞ্জনা, এর অন্তর্নিহিত শক্তি, এর গভীরতা অতুলনীয়। তাই আজ পর্যন্ত এর একটি ছোট্ট সূরার সমকক্ষ সূরা কেউ রচনা করতে পারে নি। কোরআন যেহেতু আল্লাহ সরাসরি আরবি ভাষায় নাজিল করেছেন, তাই অন্য কোনো ভাষায় এর মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রেখে অনুবাদ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে আন্তরিকতা নিয়ে এর মর্মবাণী অনুধাবন করতে চাইলে যে-কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষেই তা সম্ভব। কারণ ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের হেদায়েতের জন্যেই কোরআন নাজিল হয়েছে। তাই কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না

মুক্ত জীবনের পথে

হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহতে সমর্পিত একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আত্মনিমগ্ন হয়ে ধ্যানের স্তরে তাঁর কালামের মর্মবাণী উপলব্ধি করেছি আর বিস্মিত, চমকিত হয়েছি।

আপ্ত হইয়াছি কোরআনের বাণীর চির নতুনত্বকে উপলব্ধি করে। দেখেছি বর্তমান যুগের প্রতিটি যন্ত্রণা ও প্রতিটি জিজ্ঞাসার জবাব এক চমৎকার গাঁথুনিতে গাঁথা আছে। স্পষ্টত অনুভব করেছি, চৌদ্দ শ বছর আগে অধঃপতিত অবিদ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষগুলো এই কোরআনের বাণীর মর্মার্থ অনুধাবন ও তা অনুসরণ করে নিজেদেরকে পৃথিবীর সেরা মানুষে রূপান্তরিত করেছিলেন, আলোকোজ্জ্বল সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

একইভাবে যে-কোনো বঞ্চিত, অবহেলিত বা অধঃপতিত মানুষ যদি কোরআনের মর্মবাণীকে অনুধাবন করতে পারে, অনুসরণ করতে পারে, তাহলে সে-ও পরিণত হবে যথার্থ মানুষে, সফল মানুষে, আলোকিত মানুষে। আর এই মানুষেরাই হবে ভবিষ্যৎ আলোকোজ্জ্বল সভ্যতার নির্মাতা। সমাজ মুক্তি পাবে অবিদ্যা লালসা বঞ্চনা শোষণ ও পণ্যদাসত্বের শৃঙ্খল থেকে। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে কোরআনের গুরুত্ব অনুধাবন করার পর এর মর্মবাণী মায়ের ভাষায় প্রকাশ করার জন্যেই এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ।

মুক্ত জীবনের পথে

কোরআন শতাব্দীর পর শতাব্দী জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কোটি কোটি মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়েছে, তাদের বদলে দিয়েছে ভেতর থেকে, খুলে দিয়েছে তাদের সম্ভাবনার দ্বার, দিয়েছে প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত জীবন। তাই আল্লাহর কালামের মর্মবাণীতে আন্তরিকভাবে নিমগ্ন হোন। বার বার পড়ুন, ডুবে যান শব্দের গভীরে, বাক্যের গভীরে। কোরআনই কথা বলবে আপনার সাথে, আপনিও বদলাতে শুরু করবেন ভেতর থেকে। ধর্মে মানবিকতায় জ্ঞানে অভিজ্ঞানে হবেন এক আলোকিত মানুষ। প্রথম যুগের কোরআন অনুসারীদের মতো আপনিও দুনিয়ায় সফল ও সম্মানিত হবেন। আর আখেরাতের সম্মান তো শুধু স্রষ্টায় সমর্পিত সৎকর্মশীল মানুষদের জন্যেই। পরম করুণাময়ের করুণায় তারাই থাকবেন অনন্ত আনন্দলোকে।

কোরআন : সংরক্ষণ ও বিশুদ্ধতায় অনন্য

কোরআন নাজিলের সূচনা ৬১০ সালে। জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়বস্তু নিয়ে নাজিল হয়েছে খণ্ডে খণ্ডে, দীর্ঘ ২৩ বছরে। কোরআন পরিপূর্ণ রূপ পায় ৬৩২ সালে। কোরআনের প্রথম পঙ্ক্তিমালাই বদলে দেয় নবীজীর (স) জীবন। এরপর নবীজী (স) ও সাহাবীদের জীবন আবর্তিত হয় আল্লাহর কালাম এই কোরআনকে ঘিরেই। তাই কোরআনের প্রতিটি আয়াত বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণে প্রচেষ্টার কোনো কমতি ছিল না।

কোরআনের আয়াতাংশ, আয়াত, সূরা—যখনই যা নাজিল হতো, তখনই নবীজী (স) তা নিজে বার বার তেলাওয়াত করতেন এবং উপস্থিত সাথিদের শোনাতে। সাহাবীরা তা বার বার তেলাওয়াত করে মুখস্থ করে ফেলতেন। আর কাতিব অর্থাৎ লিপিকররা তা লিপিবদ্ধ করতেন। বিভিন্ন পর্যায়ে ৪০-এর অধিক সাহাবী কোরআন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করেছেন।

নাজিলের সূচনা থেকেই মক্কায় নবীজীর (স) সরাসরি তত্ত্বাবধানে সাহাবীরা মুখস্থ করা ও লেখার মাধ্যমে কোরআন সংকলন ও সংরক্ষণের কাজ শুরু করেন। কোরআন লিখে রাখার কাজে মোটা কাগজ, চামড়া, পাথরখণ্ড, জস্তুর হাড় ও খেজুর পাতা ব্যবহার করা হয়। আলী ইবনে আবু তালিব, উবাই ইবনে কাব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, জায়েদ ইবনে সাবিত (রা) কোরআন লিপিবদ্ধকারী হিসেবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। জায়েদ ইবনে সাবিতকে নবীজী (স) তাঁর সামনে বসেই কোরআন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কোনো আয়াত নাজিল হলেই তিনি তাকে ডেকে নিয়ে তেলাওয়াত করে শোনাতেন। আয়াতটি কোন সূরার কোন আয়াতের আগে বা পরে কোথায় বসাতে হবে, সে-সম্পর্কে নির্দেশনা দিতেন। জায়েদ সেভাবে লিপিবদ্ধ করে শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্যে তা আবার নবীজীকে (স) পড়ে শোনাতেন। এভাবে পুরো কোরআন সূরা আকারে বিন্যস্ত, লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ করার নির্ভুল প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় নবীজীর (স) জীবদ্দশাতেই।

নবীজী (স) মদিনায় হিজরত করার পর কোরআন চর্চা নতুন গতি লাভ করে। মসজিদে নববী-সংলগ্ন চত্বরে নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের এক বিশাল দল কোরআনের

জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ার জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করেন। নবীজীর (স) জীবদ্দশাতেই পুরো কোরআন মুখস্থ করেছেন এমন হাফেজের সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। আর জায়েদ ইবনে সাবিত, আলী ইবনে আবু তালিব, উসমান ইবনে আফফান, আবদুলল্লাহ ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কাব, সাঈদ ইবনুল আস, আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর, আনাস ইবনে মালেক, আবদুর রহমান ইবনে হারিস, মুয়াজ ইবনে জাবল, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আবদুর রহমান ইবনে শিহাব, আবু আইয়ুব আনসারী (রা) প্রমুখসহ ৬৫ জন সাহাবীর কাছে কোরআনের সব সূরা লিখিত আকারে ছিল। অর্থাৎ পুরো কোরআনই নবীজীর (স) জীবদ্দশায় সূরা আকারে বিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধ অবস্থায় ছিল; শুধু একত্রে ‘মসহাফ’ আকারে গ্রন্থিত হয় নি।

নবীজীর (স) ওফাতের পরই আরবের বিভিন্ন এলাকায় ভণ্ড নবীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। এদের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে বহু হাফেজ শহিদ হন। তখন ওমরের (রা) পরামর্শ ও অনুরোধে প্রথম খলিফা আবু বকর (রা) পবিত্র কোরআনকে একত্রে গ্রন্থাকারে সংকলনের উদ্যোগ নেন। রসুলুল্লাহর (স) সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ কতিব জায়েদ ইবনে সাবিতকে প্রধান করে আবু বকর (রা) একটি টিমকে এ-কাজের দায়িত্ব দেন।

খলিফা ফরমান জারি করেন যে, যার কাছে কোরআনের যে অংশ লিখিত আছে, তা জায়েদের কাছে হাজির করতে হবে। জায়েদ একইসাথে হাফেজ ও কাতিব ছিলেন। তিনি শুধু নিজের স্মৃতি ও লেখার ওপর নির্ভর করেন নি। তিনি তার কাছে লিখিত প্রতিটি আয়াতের সমর্থনে দুজন করে কাতিবের লেখার সাথে তা মিলিয়েছেন এবং সেই কাতিব যে রসুলুল্লাহর (স) সামনে এই আয়াত লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সপক্ষে দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। একইসাথে সেই আয়াত দুজন হাফেজ একইভাবে মুখস্থ করেছেন কিনা এবং তিনি যে রসুলুল্লাহর (স) সামনে সেই আয়াত শুনে মুখস্থ করেছেন, তার সপক্ষে দুজন সাক্ষী তলব করেছেন। রসুলুল্লাহ (স) যে-রকম নির্ভুলভাবে আল্লাহর কালামকে পেশ করেছেন, সংকলনের ক্ষেত্রেও সাহাবীরা ছিলেন একইরকম আন্তরিক ও সত্যনিষ্ঠ। গ্রন্থাকারে সংকলন যাতে নির্ভুল হয়, সেজন্যে তারা সর্বরকম সতর্কতাই গ্রহণ করেছিলেন।

রসুলুল্লাহর (স) জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ কোরআন আর জায়েদ ইবনে সাবিতের নেতৃত্বে সংকলিত মসহাফের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, রসুলুল্লাহর (স) সময় কাগজ, চামড়া, পাথর, খেজুর পাতা—যা পাওয়া গেছে তাতেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে আর মসহাফে একই সাইজের কাগজে লিপিবদ্ধ

করে একটার পর একটা কাগজ সাজিয়ে ওপরে-নিচে শক্ত মলাট দিয়ে বাঁধাই করা হয়েছে। শক্ত মলাট দিয়ে বাঁধাই করার কারণেই এর নামকরণ হয়েছে ‘মসহাফ’। মসহাফ তৈরি হওয়ার পর সাহাবীরা সর্বসম্মতভাবে একে সঠিক বলে সত্যায়িত করেন এবং আবু বকরের (রা) কাছে সংরক্ষণের জন্যে পেশ করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানায় তা সংরক্ষণ করেন।

রসুলুল্লাহর (স) ওফাতের একবছরের মধ্যেই পুরো কোরআন একত্রে গ্রন্থাকারে সংকলনের এই কাজ সম্পন্ন হয়। আবু বকরের (রা) পর ওমর (রা) এই মসহাফ সংরক্ষণ করেন। তাঁর সময় খেলাফতের সীমানা পারস্য থেকে লিবিয়া এবং আরব সাগর থেকে আজারবাইজান পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। তিনি এই বিশাল অঞ্চলে অভিন্ন উচ্চারণ ও বাক্-রীতিতে পবিত্র কোরআন পঠনপাঠনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পুরো কার্যক্রম তদারকির জন্যে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু মুসা আশয়ারী, মুয়াজ ইবনে জাবলসহ ১০ জন বিশিষ্ট সাহাবীকে খেলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ওমরের (রা) মৃত্যুর পর এই মসহাফ তাঁর কন্যা ও উম্মুল মোমেনিন হাফসা-র (রা) হেফাজতে সংরক্ষিত হয়।

তৃতীয় খলিফা উসমানের (রা) সময় খেলাফতের আরো

বিস্তৃতি ঘটে। তিনি সব অঞ্চলে অভিন্ন পঠনপাঠনরীতি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কোরআনের কপি করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি হাফসা-র (রা) কাছে সংরক্ষিত মসহাফ চেয়ে পাঠান। তিনি কোরাইশদের পঠন ও লিখনরীতি অনুসারে মসহাফের কপি করার জন্যে প্রধান কাতিব জায়েদ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর, সাঈদ ইবনুল আস, আবদুর রহমান ইবনে হারিস, উবাই ইবনে কাবসহ ১২ জন সাহাবীর একটি টিম গঠন করেন। তাঁরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নির্ভুলভাবে এই মসহাফের কপি করেন। উসমান (রা) একটি কপি নিজের কাছে এবং একটি মদিনার মহাফেজখানায় রেখে অবশিষ্ট কপিগুলো সত্যাযন করে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদের কাছে প্রেরণ করেন। আর মূল কপি ফেরত পাঠান হাফসা-র (রা) কাছে।

উসমানের (রা) সময় কপি করা হয়েছিল বলে ইতিহাসে এ মসহাফ পরিচিতি লাভ করে ‘মসহাফে উসমানী’ নামে। মসহাফে উসমানী-র সত্যায়িত একটি কপি এখনো সংরক্ষিত আছে মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তানের তাসখন্দ মিউজিয়ামে। দামেস্কে প্রেরিত মসহাফের অবিকল প্রতিলিপি সংরক্ষিত আছে তুরস্কে ইস্তাম্বুলের টপকাপি মিউজিয়ামে ও যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে। হরিণের চামড়ায় তৈরি কাগজে এই মসহাফের

কোরআন : সংরক্ষণ ও বিশুদ্ধতায় অনন্য

প্রতিলিপি সংরক্ষিত আছে মিশরের দারুল কুতুব সুলতানিয়ায়।

মসহাফে উসমানী বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হওয়ার পর প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোরআন কপি করার প্রচলন শুরু হয়। শতাব্দী পরিক্রমায় কোরআনের হাজার হাজার কপি সর্বত্র প্রচার লাভ করে। ইসলামের ইতিহাসের সকল যুগের কপি করা কোরআনের পাণ্ডুলিপির বিশাল সংগ্রহ রয়েছে ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, আয়ারল্যান্ডের চেস্টার বিয়াটি মিউজিয়াম ও ইংল্যান্ডের লন্ডন মিউজিয়ামে। এসব পাণ্ডুলিপির সাথে তাসখন্দ মিউজিয়াম, ইস্তাম্বুলের টপকাপি মিউজিয়াম ও মিশরে কায়রোর আল-হোসেন মসজিদে সংরক্ষিত মসহাফ মিলিয়ে দেখা গেছে যে, মূল মসহাফের লিখনের সাথে এগুলোর কোথাও কোনো অমিল নেই।

জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের The Institute for Koranforschung হাতে লেখা ৪২ হাজার কপি পূর্ণ বা আংশিক কোরআন সংগ্রহ করে। দীর্ঘ ৫০ বছর গবেষণা করার পর ইনস্টিটিউট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পাণ্ডুলিপি পাঠে কোনো পার্থক্য নেই। দুর্ভাগ্যবশত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমাবর্ষণে ইনস্টিটিউটটি ধ্বংস হয়ে যায়।

আল্লাহর অনুগ্রহ আর সাহাবীদের আন্তরিক ও বস্ত্তনিষ্ঠ

প্রয়াসের ফলে নাজিল হওয়ার সময় যেভাবে পঠিত হয়েছে, ১৪ শত বছর ধরে সারা পৃথিবীর ঘরে ঘরে এই একই কোরআন সেভাবেই পঠিত হচ্ছে। কোরআন একমাত্র ধর্মগ্রন্থ, যা তার মূল ভাষাকে ধরে রেখেছে এবং মূল ভাষাতেই পঠিত ও চর্চিত হচ্ছে। সেই একই কোরআন। ১১৪টি সূরা। ৬,২৩৬টি আয়াত।

॥ ২ ॥

কালের বিবর্তনে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কোরআনের লেখ্যরূপ বিবর্তিত হয়েছে। মসহাফে উসমানী-তে লেখায় নোকতা, জের, জবর, পেশ ইত্যাদির কোনো ব্যবহার ছিল না। সাধারণ আরবি লেখায় এখনো ওপরে বা নিচে বর্ণ পার্থক্যকারী কোনো চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। আরবরা শব্দের গঠন দেখেই বর্ণের উচ্চারণ করে। আর বাক্যের গঠন দেখেই তারা হ্রস্ব-স্বর উচ্চারণে পার্থক্য করে নেয়। ওমরের (রা) সময় খেলাফত অন্য ভাষাভাষী অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। উসমান (রা) ও আলীর (রা) সময় খেলাফত আরো ভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। বর্ণ ও পাঠসহায়ক চিহ্ন ছাড়া কোরআন পাঠে ভবিষ্যতে তারা ব্যাপক ভুলত্রুটির শিকার হতে পারে, এই আশঙ্কা দেখা দেয়। আলী (রা) বিষয়টি সুরাহা করার দায়িত্ব দেন

বিশিষ্ট ভাষাবিদ আবুল আসাদ দোয়েলীকে। তিনি মসহাফে উসমানী-তে তাশকিল অর্থাৎ পাঠসহায়ক জের, জবর, পেশ ব্যবহার করেন। বর্ণপরিচায়ক নোকতা ব্যক্তিগত মসহাফে প্রথম ব্যবহার করেন হাসান আল বসরী ও আল্লামা ইবনে শিরিন। আবুল আসাদ দোয়েলী ও তার ছাত্র নসর ইবনে আসিম ও ইয়াহিয়া ইবনে আমর ৫০ হিজরিতে কোরআন লেখায় ‘বর্ণপরিচায়ক’ নোকতা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মসহাফে ব্যবহার করেন। ৬০ হিজরিতে খলিফা আবদুল মালেকের নির্দেশে সকল মসহাফে বাধ্যতামূলকভাবে নোকতা ও তাশকিল প্রয়োগের কাজ সুসম্পন্ন হয়।

কোরআনের প্রাথমিক কপি মসহাফে উসমানী-তে কোনো সূরার আগে সূরার নাম লেখা হয় নি। রেখা টেনে বা ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’কে আলাদা করে ওপরের লাইনে লিখে এক সূরা থেকে আরেক সূরাকে পৃথক করা হয় নি। আয়াতগুলোও কোনো চিহ্ন বা সংখ্যা দিয়ে আলাদা করা হয় নি। ধারাবাহিকভাবে একের পর এক লিখে যাওয়া হয়েছে। হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষদিকে সূরার ওপর সূরার নাম এবং ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ ওপরের লাইনে আলাদা লেখার এবং দুই আয়াতের মাঝে চিহ্ন বা সংখ্যা দেয়ার পদ্ধতি চালু হয়।

হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রথমভাগে প্রতিদিন সমপরিমাণ তেলাওয়াত করে সাত দিনে পাঠ সম্পন্ন বা খতম করার সুবিধার জন্যে কোরআনকে ‘সাত মনজিলে’ ভাগ করা হয়। প্রতিবার তেলাওয়াতের হিসাব রাখার সুবিধার্থে হিজরি দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ্বে কোরআনকে ৫৫৮ ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের নাম দেয়া হয় রুকু। ৩০ দিনে কোরআন খতম করার সুবিধার্থে কোরআনকে ৩০ পারায় ভাগ করা হয় হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে। আর হাজার বছর ধরে কোরআনের এই লিখিত রূপই চালু রয়েছে সারা বিশ্বে।

॥ ৩ ॥

কোরআনের আয়াতমালা অবিকৃত ও বিশুদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রেখেছে একে মুখস্থ রাখার সহজাত আগ্রহ। রসুলুল্লাহর (স) জীবন হচ্ছে কোরআনের শিক্ষার প্রতিচ্ছবি। আর কোরআন নাজিল হয়েছে ২৩ বছর সময় নিয়ে। তিনি শুধু কোরআন শিক্ষাই দেন নি; পুরো কোরআন তাঁর মুখস্থ ছিল। তাঁকে অনুসরণ করে কোরআন মুখস্থ করতে সাহাবীদের আগ্রহের কোনো অভাব ছিল না। আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা), আয়েশা, হাফসা, উম্মে সালমা (রা) প্রত্যেকেই

হাফেজ ছিলেন। পুরো কোরআন তাঁদের মুখস্থ ছিল। রসুলুল্লাহর (স) জীবদ্দশায় মদিনাতেই হাফেজের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যায়।

সাহাবী, তাবয়ী, তাবে তাবয়ীদের জীবন আবর্তিত হয়েছে কোরআনকে ঘিরে। তাঁরা কোরআন মুখস্থ করেছেন, কোরআনের জ্ঞানে নিজেরা জ্ঞানী হয়েছেন এবং অন্যকে কোরআনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে। আর দিনে পাঁচ বার কোরআনের মুখস্থ করা অংশ থেকে তেলাওয়াত করা তো নামাজ কায়েমের জন্যে বাধ্যতামূলক। আবার রাতে দীর্ঘসময় নামাজে দীর্ঘ সূরা পাঠ পরিণত হয় অনেকের দৈনন্দিন অভ্যাসে। সেই যুগে এমন কোনো শিক্ষিত পরিবার ছিল না, যেখানে অন্তত একজন হাফেজ ছিলেন না।

কালের বিবর্তনে কোরআন মুখস্থ করা শিক্ষার একটি অংশে পরিণত হয়। হাজার হাজার হিফজখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোরআন নাজিলের ১৪ শত বছর পরও কোরআন মুখস্থকারীর সংখ্যা কোনোভাবেই হ্রাস পায় নি; বরং বেড়েছে। মুসলমানদের এমন কোনো পাড়া বা মহলা নেই, যেখানে আরব-অনারব, কালো-সাদা, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ কেউ না কেউ কোরআন মুখস্থ পারেন না। এই হিফজ শিক্ষার গুরু রসুলুল্লাহ (স) থেকে। তাঁর মাধ্যমে

কোরআন : সংরক্ষণ ও বিশুদ্ধতায় অনন্য

শিখেছেন সাহাবীরা। আর তাঁদের সত্যায়িত প্রক্রিয়াতেই এখনো প্রতি বছর হিফজ করছেন হাজার হাজার হাফেজ।

দুনিয়ায় অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে—তাওরাত, জিন্দাবেস্তা, উপনিষদ, বেদ, বাইবেল, গীতা, ধর্মপদ। আছে অনেক সেকুলার গ্রন্থ—দর্শন, কাব্য, উপন্যাস। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, এই গ্রন্থ ও রচনাবলির কতটা কতজন মুখস্থ বলতে পারবেন? খোঁজ করলে কদাচিৎ দুই-একজনকে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। কিন্তু যদি কোরআন মুখস্থকারীর সংখ্যা জানতে চান, তবে এ সংখ্যা হবে লক্ষ লক্ষ। আর এই লক্ষ লক্ষ হাফেজের স্মৃতিতে সংরক্ষিত কোরআন এবং মসহাফে উসমানী থেকে কপি করা মুদ্রিত কোটি কোটি কোরআন একই কোরআন। সংরক্ষণ ও বিশুদ্ধতায় কোরআন এ-ক্ষেত্রে অনন্য।

এই বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক তথ্যই প্রমাণ করে কোরআনে প্রদত্ত আল্লাহর অঙ্গীকারের সত্যতা :

‘নিশ্চয়ই আমি এই কোরআন (ধাপে ধাপে) নাজিল করেছি এবং (সকল প্রকার বিচ্যুতি থেকে) আমি একে রক্ষণাবেক্ষণ করব।’ (সূরা হিজর : ৯)

কেন বিশ্বাস করব?

আপনি নির্দিধায় প্রশ্ন করতে পারেন—কেন বিশ্বাস করব কোরআন আল্লাহর কালাম? কেন বিশ্বাস করব কোরআন মানুষের রচনা নয়? কেন বিশ্বাস করব যে, কোরআন অনুসরণ করলে আমি ভালো থাকব? কেন বিশ্বাস করব যে, কোরআন আমাকে পার্থিব জীবনেও সুখী ও প্রাচুর্যবান করতে পারে?

অবশ্যই বিশ্বাস করার আগে প্রশ্ন করতে হবে। সব দিক থেকে খতিয়ে দেখতে হবে। জানতে হবে। বিশ্লেষণ করতে হবে। ভাবতে হবে। বিষয়ের গভীরে ডুবে যেতে হবে। বিচার করতে হবে মুক্তমন নিয়ে, বস্তুনিষ্ঠভাবে। তাহলেই আপনি সত্যে উপনীত হতে পারবেন।

ইতিহাসের দিকে তাকান :

১. একজন মানুষ—যাঁর গুরুটাই শূন্য। পৃথিবীর আলোর মুখ দেখার আগেই পিতৃহারা। ছয় বছর বয়সে মাতৃহারা। আট বছর বয়সে আশ্রয়দাতা পিতামহকে হারান। এরপর চাচার কাছে লালিত। পড়াশোনার সুবিধাবঞ্চিত

কেন বিশ্বাস করব?

কৈশোর কেটেছে মরুভূমিতে মেষ চরিয়ে।

২. একজন মানুষ—যিনি নিরক্ষর ছিলেন। পড়তে বা লিখতে পারতেন না।

৩. একজন মানুষ—যিনি কখনো কোনো কবিতা লেখেন নি। কোথাও ভাষণ দেন নি। কোথাও ওয়াজ করেন নি। কবি, বাগ্মী বা ধর্মবেত্তা হিসেবে যাঁর কোনো পরিচিতি ছিল না।

৪. একজন মানুষ—দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, গবেষক, সমাজবিজ্ঞানী, মহাকাশবিজ্ঞানী হিসেবেও যিনি খ্যাতিমান হন নি।

৫. একজন মানুষ—যিনি ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত পরিচিত ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় সদাচারী ভালো মানুষরূপে, একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে, একজন সত্যবাদী মানুষরূপে।

৪০ বছর বয়সে তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হতে শুরু করল জীবনের বাঁকবদলকারী বাণীমালা, যা আরবি ভাষায় সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত। তিনি বললেন, আল্লাহ এই বাণীমালা তাঁর ওপর নাজিল করেছেন। আরবি ভাষার সকল কবি-সাহিত্যিক স্বীকার করলেন, না, এর মতো কোনো পঙক্তিমালা তাদের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেল কিন্তু এর মতো কোনো পণ্ডজিমালা কারো পক্ষেই রচনা করা সম্ভব হলো না।

আপনি বলতে পারেন, কালজয়ী কবি-সাহিত্যিকরাও অনন্য সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন এবং তারা সবাই মানুষ ছিলেন। তাই কোরআন যত অনন্যই হোক না কেন, তা মানুষের রচনা নয় এটা নিশ্চিত হবো কীভাবে? আসলে কালজয়ী কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মের অনন্যতা এবং কোরআনের অনন্যতার ধরনে মনোনিবেশ করলেই বিষয়টি আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১. কালজয়ী কাব্য বা সাহিত্য যে আজিকে উপস্থাপিত হয়েছে, সে আজিকটা অনন্য নয়। সেই ছন্দ বা সেই আজিকে আরো অনেকেই কাব্য বা সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু কোরআন আরবি সাহিত্যের সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অতুলনীয় এক আজিকে উপস্থাপিত হয়েছে। এই আজিকে এর আগে বা এর পরে কোনো সাহিত্য-প্রয়াসই চালানো সম্ভব হয় নি।

২. সকল কালজয়ী সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষের জন্যে শব্দের পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন বা বিয়োজন সাহিত্যিক বা কবি নিজেই করেছেন। কিন্তু কোরআনের সাহিত্যিক অনন্যতা, এর অতুলনীয় মাধুর্য, ছন্দ ও শব্দবিন্যাস সত্ত্বেও তা তৎক্ষণাত্ই বর্ণিত হয়েছে। সাহিত্যিক

কেন বিশ্বাস করব?

উৎকর্ষের জন্যে পরবর্তীতে কোনো পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন বা বিয়োজন করা হয় নি।

৩. যে-কোনো কাব্য, সাহিত্য বা শিল্পকর্মে রচয়িতার আবেগ, মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মনের দুঃখকষ্টের প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু কোরআন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দুঃখের প্রসঙ্গ বা প্রভাব একেবারেই অনুপস্থিত। তিনি তাঁর যৌবনের ২৫ বছর যে নারীর সাথে কাটিয়েছেন, তাঁর সেই প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা) মারা যান অর্ধাহারে-অনাহারে, কোরাইশদের হাতে সঙ্গীসাথিসহ পাহাড়ের পাদদেশে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায়। ২৫ বছরের প্রেম, যত্ন, সহযোগিতা সব ছেড়ে চলে গেলেন, যাঁর প্রতি নবীজী (স) ছিলেন আজীবন বিশ্বস্ত, অনুরক্ত। যিনি ছিলেন তাঁর নবুয়তের ওপর আস্থা প্রকাশকারী প্রথম ব্যক্তি, যিনি ছিলেন তাঁর আট সন্তানের মধ্যে সাত সন্তানের জননী, যিনি ছিলেন তাঁর সাধনার সহযোগী, চেতনা বিস্তারের সংগ্রামে সহযোদ্ধা। যিনি সকল সম্পদ উজাড় করে দেন তাঁর জন্যে, যিনি নিজের গোত্রীয় মর্যাদা ও সম্পর্কচ্ছেদ করেন তাঁর জন্যে, তিনি চলে গেলেন মর্মভ্রুদ কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু এসবের কোনো ধরনের উল্লেখ কোরআনে নেই। কোনো কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীর জীবন থেকে যদি এমন জীবনসঙ্গিনী হারিয়ে যেতেন, তাহলে কী পরিমাণ কাব্য,

কেন বিশ্বাস করব?

সাহিত্য, গান রচিত হতো তা যে-কেউই অনুমান করতে পারেন। অথচ কোরআনে হযরত ইব্রাহিম (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত লূত (আ) এবং ফেরাউনের স্ত্রীর কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স)-এর স্ত্রী খাদিজার (রা) কোনো উল্লেখ নেই। কোরআনে নাম উল্লেখ করে একমাত্র যে নারীর কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন বনি ইসরাইলি নবী হযরত ঈসার (আ) মাতা বিবি মরিয়ম। মনুষ্য রচনা নয়, শুধু ঐশীবাণী হলেই এমনটি সম্ভব।

৪. হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর চোখের সামনে চারটি ছেলের প্রত্যেকের মৃত্যু দেখেছেন। তাঁর চার মেয়ের তিন জনই তাঁর জীবদ্দশায় মারা যান। তাঁর প্রিয়তম চাচা হামজা-র লাশের সাথে পাশবিক আচরণ, তাঁর সাথীদের ওপর ক্রমাগত লাঞ্ছনা, শারীরিক নির্যাতন এমনকি অনেককে হত্যা করা হয়। তাঁর ওপরও চালানো হয় শারীরিক-মানসিক নির্যাতন। একবার তিনি যখন কাবাঘরের সামনে সেজদারত অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁর ওপর উটের পচা নাড়িভুঁড়ি স্তূপাকারে ফেলা হয়। পরিমাণ এতটাই ছিল যে, তাঁর শরীর মাটির সঙ্গে লেগে যায়। তাঁর কন্যা তাঁর শরীরের ওপর থেকে পচা নাড়িভুঁড়ি না সরানো পর্যন্ত তিনি মাথাই তুলতে পারেন নি। একবার কল্পনা করুন, গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরে পচা নাড়িভুঁড়ির স্তূপ ফেলা হলো আপনার শরীরের ওপর, আর

কেন বিশ্বাস করব?

তা থেকে নিঃসৃত রস আপনার ঘাড়ে, কাঁধে, কানের দুপাশ দিয়ে নাকে, ঠোঁটের দিকে গড়িয়ে আসছে! পচা নাড়িভুড়ির উৎকট দুর্গন্ধের কথা বাদ দিলেও কতটা বিরক্তিকর স্নায়ু-উত্তেজক বিষয় হতে পারে এটা! এরকম ঘটনা কারো স্মৃতিকে বিষণ্ণ বিরক্ত না করে পারে না। অথচ এর কোনো উল্লেখ কোরআনে পাওয়া যায় না।

কোরআনে রসুল (স)-এর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের প্রতিফলনের পরিবর্তে কোথাও কোথাও তাঁর চিন্তাকে পরিমার্জিত করা হয়েছে। যখন রসুল (স) আগ্রহী অন্ধ বৃদ্ধের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দিকে মনোযোগ দিলেন, তখন সূরা আবাসায় তাঁর এ-কাজটি যে উচিত হয় নি, তা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। রসুল (স) যখন স্ত্রীদের মনরক্ষা করার জন্যে মধু না খাওয়ার শপথ করেছিলেন, তখন সূরা তাহরিমের প্রথম আয়াতে তা সংশোধন করে নিতে বলা হয়। রসুলের (স) দু-একটা ছোটখাটো মানবীয় ত্রুটিকেও কোরআন সংশোধন করে দিয়েছে, যেন এ-কাজটা আল্লাহ-অনুমোদিত কাজ হিসেবে প্রচলিত না হয়ে যায়। যদি কোরআন মানবরচিত হতো, তবে রচনাকারী তার ভুলকে কখনোই প্রকাশ্যে আনতেন না। বরং তিনি যে কত সঠিক, আয়াতে আয়াতে তা-ই প্রমাণ করার চেষ্টা হতো।

কেন বিশ্বাস করব?

শুধু এ কালের সংশয়ীরাই নয়, রসুল-যুগের সংশয়ীরাও প্রথমে বলার চেষ্টা করেছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (স) কোরআনের রচয়িতা। এর জবাবে আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের চ্যালেঞ্জ দেন, কোরআনের সূরার মতো ১০টি সূরা রচনা করে আনার জন্যে : ‘ওরা কী বলছে? কোরআন তুমি রচনা করেছ? (হে নবী!) ওদের বলো, যদি তা-ই হয়ে থাকে, তবে তোমরা এ ধরনের ১০টি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পারো সাহায্যের জন্যে ডাকো। যাদেরকে ডাকছ তারা যদি তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম না হয়, তবে জেনে রাখো, আল্লাহর প্রজ্ঞা থেকেই এ কোরআন নাজিল হয়েছে। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এরপরও কি তোমরা তাঁর কাছে সমর্পিত হবে না?’ (সূরা হুদ : ১৩-১৪)

কিন্তু যখন তারা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়, তখন আল্লাহ ১০টির জায়গায় শুধু একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসতে বলেন : ‘আমি আমার বান্দার প্রতি ধাপে ধাপে যা নাজিল করেছি, তাতে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তবে এর মতো একটিমাত্র সূরা রচনা করো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব সাহায্যকারীকে ডাকো। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে একটি সূরা এনে দেখাও। আর যদি তা না পারো এবং তা তোমরা কখনোই

কেন বিশ্বাস করব?

পারবে না, তাহলে সচেতন হও জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।’ (সূরা বাকারা : ২৩-২৪)

সবশেষে আল্লাহ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সত্য অস্বীকারকারীদের চূড়ান্ত ব্যর্থতার ভবিষ্যদ্বাণী করেন : ‘(হে নবী! ওদের) বলো, পৃথিবীর সকল মানুষ ও জ্বীন যদি একযোগে সকল শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা চালায়, তবুও এ কোরআনের মতো আরেকটি কোরআন আনতে পারবে না।’ (সূরা বনি ইসরাইল : ৮৮)

প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ কিছু মোজেরা দেখানোর সামর্থ্য দিয়েছেন; যা সে-স্থান ও কালেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে-সময় যারা তা প্রত্যক্ষ করেছে শুধু তারাই বিষয়টি অনুধাবন করার সুযোগ পেয়েছে। আর রসুল (স)-এর প্রতি নাজিল করা কোরআন নিজেই এক মোজেরা অর্থাৎ অলৌকিক নিদর্শন; যার একটি সূরার মতো সূরা আজ পর্যন্ত কেউ রচনা করতে পারে নি এবং কোনোদিনই তা পারবে না। আর এ অলৌকিক নিদর্শন সগৌরবে মূল ভাষায় পূর্ণাঙ্গরূপে বিরাজ করবে কেয়ামত পর্যন্ত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনন্তকাল ধরে এ থেকে লাভ করবে সঠিক জীবনদৃষ্টি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, প্রাচুর্য ও কল্যাণ। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্যে ধন্য হবে তাদের জীবন।

কেন বিশ্বাস করব?

॥ ২ ॥

‘বিশ্বাস’ প্রসঙ্গটি আমরা মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখতে পারি। আমরা সবাই কিছু না কিছু বিশ্বাস করি। এ বিশ্বাস হতে পারে কোনো ধারণায়, কোনো মতবাদে, কোনো ব্যক্তিমানুষে। আমাদের বিশ্বাস গড়ে ওঠে কখনো কোনো ব্যক্তির বক্তব্য শুনে বা চারপাশের মানুষের খণ্ড খণ্ড কথা শুনে, তাদের আচার-আচরণ দেখে।

বিশ্বাস ও অবিশ্বাস আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বিশ্বাসের প্রকৃতি ইতিবাচক। আর অবিশ্বাসের প্রকৃতি নেতিবাচক। একটা হ্যাঁ। আরেকটা না। ‘আমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি’—এটা হলো ইতিবাচক বিশ্বাস। ‘আমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না’—এটাও একটা বিশ্বাস, তবে নেতিবাচক বিশ্বাস। এটাই হলো অবিশ্বাস, অর্থাৎ বিশ্বাসের অপর পিঠ। এ-ক্ষেত্রে আমরা প্রায়শই তৃতীয় একটা শব্দ শুনি। সেটি হলো সংশয়। আসলে নিজের সহজাত বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর আস্থাহীনতার প্রকাশই হচ্ছে সংশয়। সংশয় বা সন্দেহপ্রবণতা আসলে একটি মনোরোগ।

আমাদের বিশ্বাসের শিকড় রয়েছে ডিএনএ-রই গভীরে। তাই প্রতিটি মানুষ বিশ্বাস করে। কেউ স্রষ্টায় বিশ্বাস করে, কেউ করে শয়তানে, কেউ ভালো মানুষে

কেন বিশ্বাস করব?

বিশ্বাস করে, কেউ বিশ্বাস করে প্রতারকে, কেউ বিশ্বাস করে সাধুকে, কেউ বিশ্বাস করে ভণ্ডকে। কেউ দেখে অন্তর, কেউ দেখে চাকচিক্য। কেউ দেখে সারল্য, কেউ দেখে জৌলুস। তাই আপনার বিশ্বাসের ভিত্তিটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি ভিত্তি মজবুত হয়, আপনি তার ওপর প্রাসাদ গড়তে পারবেন। আর যদি তা হয় চোরাবালি, আপনি অতলে তলিয়ে যাবেন। আর বাস্তবতা হচ্ছে, ব্যর্থ হতাশা শোষিত বন্ধিতরা সত্যের পরিবর্তে মিথ্যাকে, বাস্তবতার পরিবর্তে অলীক কল্পনাকে, সরল সত্যবাদীর পরিবর্তে ধূর্ত বাক্যবাণীশকে, নিখাদ সত্যবাণীর পরিবর্তে শ্রুতিমধুর বাগাড়ম্বরকে বিশ্বাস করে। নির্বোধরা নিজের দায়িত্ব নিজে না নিয়ে অন্যের ওপর ছেড়ে দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এ কারণেই তারা প্রতারিত হয়, দুর্দশায় হাবুডুবু খায়।

এখন আপনার সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। আপনি কাকে বিশ্বাস করবেন—সত্য না মিথ্যাকে, সদাচারীকে না দুরাচারীকে, সেবককে না শোষককে, উপকারীকে না প্রতারককে? আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে—নিজের দায়িত্ব নিজে নিয়ে সাফল্যের সরলপথে চলবেন, না অন্যের ওপর নিজের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যকে দোষারোপ করে দুর্দশায় হাবুডুবু খাবেন?

ইতিহাসের দিকে তাকান। আরব। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

কেন বিশ্বাস করব?

অবিদ্যা, অনাচার আর অত্যাচার, হিংসা ও হানাহানিতে নিমজ্জিত এক সমাজ। যেখানে নিজের কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেয়ার মতো নৃশংসতা ছিল পৌরুষের প্রতীক, সেখানে জন্মগ্রহণ করেন হযরত মুহাম্মদ (স)। পিতৃমাতৃহীন হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রচেষ্টায় তিনি নিজেকে একজন সৎ ও সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সত্যবাদী হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি ছিল সর্বজনবিদিত। সদা সত্যবাদিতার জন্যে তাঁকে আল-আমিন অভিধায় ভূষিত করা হয়।

মানুষের দুঃখ, সামাজিক অনাচার, জুলুম, বঞ্চনা ও নৃশংসতা তাঁকে ব্যথিত করে। এ থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধানে তিনি নগর থেকে দূরে হেরা গুহায় ধ্যানে নিমগ্ন হতে শুরু করলেন। প্রতি বছর রমজান মাসে তিনি সেখানে ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। ধ্যানে নিমগ্ন থাকাকালে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ৪০ বছর বয়সে তাঁর কাছে জিবরাইল (আ)-এর আগমন ঘটে। ঘটনার বর্ণনায় নবীজী (স) বলেন, ‘জিবরাইল বলল, পড়ো!’ আমি জবাবে বললাম, ‘আমি পড়তে জানি না।’ তখন জিবরাইল আমাকে জাপটে বুকে চেপে ধরলে আমার মনে হলো আমি মরে যাচ্ছি। আবার বললাম, ‘আমি পড়তে জানি না।’ এইভাবে তিন বার বুকে চেপে ধরার পর আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, ‘কী পড়ব?’ তখন জিবরাইল বলল, ‘পড়ো! তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে।

কেন বিশ্বাস করব?

যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিষিক্ত ডিম্ব থেকে। পড়ো!
তোমার প্রতিপালক মহান দয়ালু। তিনি মানুষকে জ্ঞান
দিয়েছেন কলমের। আর মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে
জানত না।’

আমি পড়লাম। জিবরাইল আমাকে ছেড়ে চলে গেল।

নবীজী (স) বলেন, উস্কোখুস্কো কবিদের আমার
মোটাই পছন্দ না। আমার মনে হলো, কোরাইশরা সব
শুনলে আমাকে ওদের (কবিদের) দলেই ফেলে দেবে। নানা
ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে আমি পাহাড়ের ওপরদিকে উঠতে শুরু
করলাম। হঠাৎ ওপর থেকে শুনি শব্দ ভেসে আসছে—‘আমি
জিবরাইল। মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রসুল।’ আমি
ওপরদিকে তাকালাম, আমি জিবরাইলকে দেখলাম মানুষের
রূপে—পা মাটিতে আর দেহ দিগন্তবিস্তৃত। সে আবার
বলল, ‘মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রসুল। আর আমি
জিবরাইল।’ আমি স্থাণুর মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।
নড়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেললাম। দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্যদিকে
তাকানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু যদিকে তাকাই দিগন্তবিস্তৃত
তাকেই দেখতে পাই। একসময় সে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে
গেল। আমি ঘরে ফিরে এলাম।

হযরত মুহাম্মদ (স) গুহা থেকে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে
ফিরে এলেন। স্ত্রী খাদিজাকে (রা) বললেন, ‘আমাকে কন্মল

কেন বিশ্বাস করব?

দিয়ে ঢেকে দাও।’ তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। কাঁপুনি থেমে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থায় এলে তিনি বিস্ময়ের সাথে খাদিজাকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমার কী হয়েছে?’ পুরো ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করে তিনি বললেন, ‘আমার ভয় হচ্ছে।’ খাদিজা (রা) উত্তরে বললেন, ‘আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনি বিশ্রাম নিন। আল্লাহ আপনার কোনো অমঙ্গল করতে পারেন না। কারণ আপনি সত্যবাদী, দানশীল, অতিথিপরায়ণ ও ভালো কাজে এবং অন্যের প্রয়োজনে সাহায্যকারী। আপনি ঠিক দেখেছেন। আমি বিশ্বাস করছি, আপনি আল্লাহর রসুল।’

এরপর খাদিজা (রা) নবীজীকে (স) নিয়ে মক্কায় বসবাসকারী তখনকার বিশিষ্ট খ্রিষ্টান পণ্ডিত ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে যান। সব কথা শুনে বর্ষীয়ান ওয়ারাকা বললেন, ‘এই বাণীই মুসার ওপর নাজিল হয়েছিল। বড় ইচ্ছা হয়, আমি যদি তরুণ হতাম তাহলে এই নগরের অধিবাসীরা যখন তোমাকে নগর থেকে বের করে দেবে, তখন আমি তোমার পাশে থাকতাম।’

নবীজী (স) বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘নগরবাসীরা আমাকে বের করে দেবে কেন?’ ওয়ারাকা বললেন, ‘আসলে শত্রু তার মুখোমুখি না হয়ে কোনো নবীই সত্যবাণী প্রচার করতে পারে নি। আমি যদি ততদিন বেঁচে

কেন বিশ্বাস করব?

থাকি আমি অবশ্যই তোমাকে সমর্থন করব।' কিন্তু কিছুদিন পরই ওয়ারাকা মারা যান।

আসলে একজন মানুষ কতটা আন্তরিক ও নিজের কাছে সৎ হলে হেরা পাহাড়ের ঘটনা এত অকপটে বলতে পারেন! বিষয়টি তাঁর কাছেই কত অপ্রত্যাশিত ছিল এবং তিনি কতটা শক্তিত ও হতবিস্মল হয়ে পড়েছিলেন, তা ঘটনার বিবরণ থেকেই বোঝা যায়। (যদি কেউ নিজেকে নবী ঘোষণার জন্যে পূর্বপরিকল্পিতভাবে কাজ করত, তবে তার নবুয়ত লাভের কল্পিত ঘটনায় নিজের মহত্বকেই নানাভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করত। নিজের মানবীয় দুর্বলতার কথা কখনোই প্রকাশ পেতে দিত না।) আর একজন মানুষ স্ত্রীর কাছে কতটা সৎ ও বিশ্বস্ত থাকলে ১৫ বছর একসাথে ঘর করার পর একমুহূর্ত দ্বিধা না করে স্ত্রী বলতে পারেন যে, 'আমি বিশ্বাস করছি আপনি আল্লাহর রসুল', তা-ও আমরা আঁচ করতে পারি।

এই সৎ ও সত্যবাদিতা ঘরে-বাইরে কতটা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তা-ও আমরা বুঝতে পারি এর তিন বছর পরের একটি ঘটনা থেকে। তিন বছর ধরে তিনি সংগোপনে নতুন বিশ্বাসের কথা প্রচার করে আসছিলেন। এরপর তিনি আদিষ্ট হলেন প্রকাশ্যে আল্লাহর বাণী প্রচার করতে। তাই তিনি মক্কার কেন্দ্রে সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে প্রতিটি গোত্রের নাম

কেন বিশ্বাস করব?

ধরে তাদের পাহাড়ের পাদদেশে জড়ো হওয়ার আহ্বান জানালেন। শহরে দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেয়ার জন্যে মুহাম্মদ সবাইকে ডেকেছেন। শহরের চারদিক থেকে লোকজন দ্রুত এসে সেখানে সমবেত হলো। সবাই সমবেত হওয়ার পর নবীজী (স) তাদের সামনে প্রশ্ন রাখলেন, ‘যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, এই পাহাড়ের ওপারে বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী মক্কা আক্রমণের জন্যে সমবেত হয়েছে, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?’ সবাই একবাক্যে জবাব দিল, ‘অবশ্যই। কারণ আপনি সত্যবাদী, কখনো আপনাকে আমরা মিথ্যা বলতে শুনি নি।’ রসুলের সত্যবাদিতার সাক্ষ্য একসাথে দেয়ার পরও তিনি যখন আল্লাহর নির্দেশের কথা বললেন, তখন বদমেজাজী ধনাঢ্য বিলাসী ব্যবসায়ী আবু লাহাব চিৎকার করে উঠল, ‘তোমার বিনাশ হোক! এই উদ্ভট বিষয় শোনাতে তুমি আমাদের ডেকেছ!’ সমবেত সাধারণ কোরাইশরা শোষক আবু লাহাবের পক্ষ নিয়ে রসুলকে প্রত্যাখ্যান করে গালিগালাজ করতে করতে চলে গেল। রসুল (স) কিছুক্ষণ পর দেখলেন পাহাড়ে তিনি একাই দাঁড়িয়ে আছেন। বুঝলেন আসন্ন সময় হবে কত কঠিন!

সংশয়ী মন এখানেও প্রশ্ন করতে পারে, হ্যাঁ, তিনি সত্যবাদী ছিলেন, ঠিক আছে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তিনি তো

কেন বিশ্বাস করব?

মিথ্যাও বলতে পারেন?

এর উত্তর খুব সহজ। একজন পুরুষ মানুষ সাধারণত পাঁচটি কারণে মিথ্যা বলতে পারে। ১. মিথ্যা বলাটাই তার স্বভাব। ২. অর্থের জন্যে। ৩. ক্ষমতার জন্যে। ৪. নারীর জন্যে। ৫. জীবন বাঁচানোর জন্যে।

প্রথম কারণটা নবীজীর (স) বেলায় পুরোপুরিই অনুপস্থিত। কারণ তিনি কখনো মিথ্যা বলেন নি। তিনি সমাজে আল-আমিন অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী অভিধায় ভূষিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবেই আমরা বলতে পারি, কোরআনের বাণী প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্যে কোরাইশ নেতারা সম্মিলিতভাবে তাঁকে প্রকাশ্য প্রস্তাব দিয়েছিল—‘যত অর্থ চাও আমরা তোমাকে দেবো, নেতৃত্ব চাও তোমাকে নেতা বানাব, যদি রাজত্ব চাও তোমাকে রাজা বানাব, তুমি শুধু তোমার বাণী প্রচার থেকে বিরত থাকো।’ নবীজী (স) বলেছিলেন, ‘যদি আমার এক হাতে সূর্য আর অপর হাতে চন্দ্র এনে দাও, তবুও আমি সত্যবাণী প্রচার থেকে বিরত হবো না।’ তাহলে আমরা দেখছি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণও এ-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। চতুর্থ কারণ প্রসঙ্গে আমরা খুব সহজেই বলতে পারি, স্ত্রী বিবি খাদিজাই ছিলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর জীবনে সবচেয়ে প্রিয় নারী। পরবর্তী জীবনে অন্য সকল বিয়েই ছিল

কেন বিশ্বাস করব?

বিভিন্ন প্রেক্ষাপট পূরণের প্রয়াস। আর পঞ্চম কারণও তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং বলা যায়, কোরআনের বাণী প্রচারের জন্যে তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন বার বার।

প্রশ্ন করতে পারেন, কেন তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করতে গেলেন? তিনি তো খেয়েপরে ব্যবসাবাণিজ্য ঘরসংসার নিয়ে প্রাচুর্যের মধ্যেই ছিলেন। তারপরও তিনি কেন নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে গেলেন?

উত্তর একটাই। তা হলো, মানুষের দুঃখদুর্দশা শোষণবঞ্চনার অবসানের জন্যে। নিপীড়িত লাঞ্চিত সর্বহারা মানুষের মুক্তির জন্যে। অবহেলা-অপমানে জর্জরিত নারীর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে। দুর্ভাগ্যকে নিয়তির লিখন ভেবে স্বনির্মিত শৃঙ্খলে বন্দি মানুষকে মুক্ত করে তার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের জন্যে। মানুষকে পৃথিবীতে তার যথাযোগ্য মর্যাদায় আসীন করার জন্যে। এককথায় মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পরিত্রাণের জন্যে।

নবীজীর (স) নবুয়ত-পরবর্তী ২৩ বছরের জীবন আশাহত সাধারণ মানুষকেও ধ্যানী, জ্ঞানী, কর্মী ও অভিযাত্রীতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে প্রাণান্ত প্রয়াসের জীবন। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত অনুসারীদের নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়ন, গভীর রাতে আল্লাহর ধ্যান ও ইবাদতে

কেন বিশ্বাস করব?

নিজেকে নিমগ্ন রাখা আর প্রতিটি কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য কাজে নিজে মাঠে থেকে নেতৃত্ব দেয়ার জীবন। ছোটবেলায় লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত একজন নিরক্ষর মানুষের জীবনও যে কত বৈচিত্র্যময় হতে পারে, তাঁর জীবনই এর জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি একাধারে সংসারী, ব্যবসায়ী, সেবক, ধর্মপ্রচারক, প্রাজ্ঞ শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক, কূটনীতিবিদ, বিচারক, সেনানায়ক এবং রাষ্ট্রনায়ক। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সাফল্যের অনন্য দৃষ্টান্ত। ফলে তিনি এমন এক চেতনার বীজ বপন করে গিয়েছিলেন, যা মধ্যযুগে সৃষ্টি করেছিল এক আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা।

তিনি শুধু স্রষ্টাপ্রেমিক ছিলেন না, ছিলেন সৃষ্টির অকৃত্রিম প্রেমিক। সৃষ্টির অধিকারকে তিনি সবার জন্যে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নদনদী, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, পশু-প্রাণীও এই সংজ্ঞা থেকে বাদ যায় নি। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে তিনি প্রতিটি মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্মান ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করেছেন। প্রতিটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার সামাজিক দায়বদ্ধতাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে নারী যাপন করত মানবেতর জীবন, সেই নারীকে তিনি প্রথম দিয়েছেন কুমারী-নামে পরিচিত হওয়ার অধিকার। দিয়েছেন জ্ঞানার্জন ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার,

কেন বিশ্বাস করব?

একা নির্বিঘ্নে চলার অধিকার, নিজস্ব উপার্জন, স্বাধীন পেশা এমনকি সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে অংশ নেয়ার অধিকার, বিয়ের ব্যাপারে নিজস্ব মত প্রদান এবং প্রয়োজনে তালাক দানের অধিকার। তিনি জীবদ্দশায় নারীর পরিপূর্ণ মানবিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

কোরআন যে আল্লাহর কালাম তা বিশ্বাস করার জন্যে এ সত্যটুকুই যথেষ্ট যে, যাঁর মুখ থেকে এই পবিত্রবাণী নিঃসৃত হয়েছে—তিনি সত্যবাদী ছিলেন, তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, তিনি মজলুমের সমব্যথী ছিলেন। আর তিনি শুধু নিজের ধর্মই প্রচার করেন নি। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে ('মদিনা সনদ'-এ) প্রত্যেক ধর্মের মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকারকে সুরক্ষিত করেছেন। মানবজাতির ইতিহাসে তিনিই ছিলেন মানবাধিকারের প্রথম সার্থক রূপকার।

‘যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি
কখনো সমান হতে পারে?’ ৩৯:৯

সূরা ফাতেহা

রুকু ১ ॥ আয়াত ৭ ॥ মাক্কী

আউযুবিলাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা মহাবিশ্বের প্রতিপালক
হে আল্লাহ তোমারই জন্যে ।

২. তুমি দয়াময়! মেহেরবান!

৩. কর্মফল দিবসের মালিক!

৪. আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি—

শুধু তোমারই সাহায্য চাই ।

৫-৬. (প্রভু হে!) সাফল্যের সরলপথে,

তোমার প্রিয়জনদের পথে

আমাদের পরিচালিত করো ।

৭. (প্রভু হে!) বিভ্রান্ত ও অভিশপ্তদের

অন্ধকার পথ থেকে

তুমি আমাদের রক্ষা করো । (আমিন!)

আমপারা (পারা ৩০)

৭৮. সূরা নাবা

রুকু ২ ॥ আয়াত ৪০ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

ওরা কী নিয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?
২-৫. কেয়ামতের মহাসংবাদ নিয়ে? ওরা সুস্পষ্টভাবেই এ
নিয়ে মতবিরোধ করছে। করুক! সময় এলেই ওরা জানতে
পারবে। (আবারো বলছি) সময় এলেই ওরা সত্যকে
জানতে পারবে।

৬-১১. আমি কি জমিনকে বিছিয়ে দেই নি আর পাহাড়কে
ভারসাম্য স্থাপন বানাই নি? আমি তোমাদের জোড়ায়
জোড়ায় (নারী ও পুরুষ হিসেবে) বিপরীত ও পরিপূরকরূপে
সৃষ্টি করেছি। আমি ঘুমকে করেছি মৃত্যুর রূপক। রাতকে
করেছি (মৃতের) আবরণ আর দিনকে করেছি কর্ম ও
প্রাণপ্রবাহের প্রতীক।

১২-১৬. আমি তোমাদের ওপর নভোমণ্ডলকে সাত স্তরে
বিন্যস্ত করেছি। স্থাপন করেছি এক উত্তম উজ্জ্বল প্রদীপ

(সূর্য)। আর বায়ুতাড়িত মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছি অফুরন্ত পানি, যা দিয়ে উৎপন্ন হয় শস্য-লতাগুল্ম, তৈরি হয় ঘন পত্রপুষ্প শোভিত বাগান।

১৭-২০. নিশ্চয়ই (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়কারী) মহাবিচার দিবস নির্ধারিত আছে। সেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন তোমরা দলে দলে সমবেত হবে। দৃশ্যমান আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, তা পরিণত হবে দিগন্ত প্রসারিত দরজার পর দরজায়। পাহাড়-পর্বত উধাও হয়ে যাবে মরীচিকার ন্যায়।

২১-২৬. নিশ্চয়ই সেদিন জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে এবং এটিই হবে সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থল। জাহান্নামে ওরা থাকবে যুগ যুগ ধরে। সেখানে ওরা না পাবে আরামদায়ক ঠান্ডার স্বাদ, না পাবে তৃষ্ণা নিবারণকারী পানি। ওরা স্বাদ নিতে পারবে শুধু বিশী দুর্গন্ধময় আঠালো ফুটন্ত পানীয়ের। এটি হবে ওদের পাপের উপযুক্ত প্রতিফল।

২৭-৩০. ওরা কখনো আশঙ্কা করে নি যে, ওদের কাজের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। ওরা একরোখাভাবে আমার বাণীকে অস্বীকার করেছিল। ওদের প্রতিটি কাজের পূর্ণ বিবরণ সংরক্ষিত ছিল। (তখন আমি বলব) এখন স্বাদ নাও নিজ নিজ কৃতকর্মের! ভোগ করো আজাবের পর আজাব!

॥ রুকু ২ ॥

৩১-৩৫. নিঃসন্দেহে আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে দিনটি হবে সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তির। তাদের জন্যে অপেক্ষা করবে আঙুর ও ফুলফল শোভিত বাগান, উচ্ছ্বসিত সুখের পানপাত্র আর সুযোগ্য সমুজ্জ্বল সাথিরা। সেখানে তারা শুনবে না কোনো অসার বাক্য বা মিথ্যাকথা।

৩৬-৩৮. তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এটাই হবে যথোচিত দান ও পূর্ণমাত্রার পুরস্কার। তিনি পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত সবকিছুরই একচ্ছত্র মালিক। তিনি দয়াময়। তাঁর সামনে কথা বলার শক্তি কারো নেই। সেদিন সকল আত্মা ও ফেরেশতারা কাতারে কাতারে নীরবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে-ই শুধু কথা বলবে এবং যথার্থ সত্যকথা বলবে।

৩৯. কেয়ামত নির্ধারিত দিনেই হবে এবং এটি চূড়ান্ত সত্য। অতএব যার ইচ্ছা প্রতিপালকের সন্তুষ্টির পথ গ্রহণ করুক।

৪০. আমি তোমাদের অবধারিত শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি। সেদিন প্রত্যেকেই তার সারাজীবনের কৃতকর্ম চোখের সামনে দেখবে এবং সত্য অস্বীকারকারীরা আতর্নাদ করে বলবে, ‘হায়! আমি যদি স্রেফ ধূলামাটি হতাম।’

৭৯. সূরা নাজিয়াত

রুকু ২ ॥ আয়াত ৪৬ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও (গ্রহনক্ষত্রের দিকে), যা উদিত হয় আবার ডুবে যায়। ২-৫. যা (তাদের কক্ষপথে) সুনির্দিষ্ট গতিতে চলে, যা (মহাকাশে) ভেসে বেড়ায় সহজ গতিতে, আবার কখনো একটা আরেকটাকে পাশ কাটিয়ে যায় দ্রুত, আর এভাবেই তারা (স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী) চালিত করে নিজেদের।

৬-৯. নিশ্চয়ই কেয়ামত হবে। সেদিন প্রথম শিক্ষাধ্বনির সাথে সাথে প্রকম্পিত হবে সব। তারপর আসবে শিক্ষার দ্বিতীয় বজ্রনিদাদ। সেদিন অনেক হৃদয় হবে থরথর কম্পমান, অনেক দৃষ্টি হবে ভীতিবিহ্বল, অবনত।

১০-১২. ওরা বলে, আমরা কি আগের অবস্থায় পুনর্জীবিত হবো, পচাগলা জীর্ণ অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও? ওরা বলে, তা-ই যদি হয়, সেটা হবে সর্বনাশা পুনর্জীবন।

১৩-১৪. আসলে এ-তো শুধু একটিমাত্র বিকট আওয়াজ। আর সত্যের মুখোমুখি হবে তারা।

১৫-১৯. তোমার কাছে মুসার কথা পৌঁছেছে কি? তার প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় তাকে ডেকে বলেছিলেন, ফেরাউনের কাছে যাও। সে সীমালঙ্ঘন করেছে।

(ফেরাউনের কাছে গিয়ে) তাকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কি পবিত্র হতে চাও? যদি চাও, তবে আমি তোমাকে প্রতিপালকের পথ দেখাব, যাতে তুমি আল্লাহ-সচেতন হতে পারো।

২০-২৪. এরপর মুসা ফেরাউনের কাছে গেল। সে আল্লাহর মহিমার মহানিদর্শন দেখাল। কিন্তু ফেরাউন মুসার ওপর মিথ্যা আরোপ করল এবং সত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহী হলো। এরপর সে মুসার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের লোকদের সমবেত করে ঘোষণা করল, ‘আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক!’

২৫-২৬. অতঃপর আলাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন আজাবে পাকড়াও করলেন। যারা আল্লাহ-সচেতন তাদের প্রত্যেকের জন্যে এতে শিক্ষা রয়েছে।

॥ রুকু ২ ॥

২৭-৩৩. (হে মানুষ!) তোমাদের সৃষ্টি করা কঠিন, না এই বিশাল মহাবিশ্বকে? তিনিই বিশাল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই নভোমণ্ডলকে সম্প্রসারিত ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন আর দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল। আর তিনি জমিনকে বিস্তৃত করেছেন। জমিন থেকে উৎসারিত করেছেন বর্ণাধারা আর তৈরি

করেছেন চারণভূমি। এবং তিনি পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। আর এ সবই তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর জীবনোপকরণের জন্যে।

৩৪-৩৬. অতঃপর যখন কেয়ামতের মহাক্ষণ উপস্থিত হবে, প্রত্যেকেই তার কৃতকর্ম এক এক করে মনে করবে এবং জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখা দৃশ্যমান হবে তাদের সামনে।

৩৭-৩৯. আসলে যে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনের লোভ-লালসাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, জাহান্নামই হবে তার নিবাস।

৪০-৪১. অপরদিকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে ভেবে যে শঙ্কিত ছিল এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল, জান্নাতই হবে তার আবাস।

৪২-৪৫. (হে নবী!) ওরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কখন কেয়ামত হবে? এ ব্যাপারে তোমার কী বলার আছে! এ পরমজ্ঞান তো শুধু তোমার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। তুমি তো শুধু সতর্ককারী, যারা সত্য সম্পর্কে সচেতন হতে চায় তাদের জন্যে।

৪৬. যেদিন ওরা কেয়ামত দেখবে, সেদিন ওদের মনে হবে ওরা পৃথিবীতে কাটিয়েছে মাত্র একটি সন্ধ্যা বা রাত, যা পেরিয়ে হয়েছে সকাল।

৮০. সূরা আবাসা

রুকু ১ ॥ আয়াত ৪২ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

সে (রসূল) ঙ্গ কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ২-৪. কারণ তার কাছে এসেছিল এক অন্ধ। তুমি কেমন করে জানবে? সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো বা সত্যকে পুনরায় ভেতরে গেঁথে নিত এবং উপদেশ থেকে উপকৃত হতো।

৫-৭. অপরদিকে যে উন্মাদিক, নিজেকে বড় ভাবে, তার প্রতি তুমি মনোযোগ দিয়েছ; কিন্তু সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে ব্যর্থ হলে তার কোনো দায়দায়িত্ব তোমার নেই।

৮-১০. আর যে পুরো আন্তরিকতা নিয়ে ভয়ে ভয়ে তোমার কাছে ছুটে এলো, তাকে তুমি উপেক্ষা করলে!

১১-১৬. না, এমন করা কখনো উচিত নয়। আসলে এ বাণীসমূহ তো উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা সে সম্মানিত পৃষ্ঠচরিত্রের লিপিকরের হাতে লিপিবদ্ধ পবিত্র সত্য সুন্দর ও কল্যাণকর এই লিপিকার উপদেশ গ্রহণ করবে।

১৭. (কিন্তু প্রায়শই) মানুষ নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে, কত একগুঁয়ে হয়ে সে সত্যকে অস্বীকার করে!

১৮-২২. (মানুষ কি কখনো চিন্তা করে) আল্লাহ কী বস্তু দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন? তিনি একবিন্দু শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি

করেছেন এবং তার (দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব) প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন। জীবনে চলার পথ সহজ করার বুদ্ধি দিয়েছেন। তারপর তার মৃত্যুর ও মাটিতে মিশে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এরপর তিনি যখন ইচ্ছা তাকে পুনর্জীবিত করবেন। ২৩. না, এরপরও মানুষ আল্লাহ-অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে নি।

২৪-৩২. হে মানুষ! তুমি তোমার খাবারের উৎস নিয়ে একটু চিন্তা করো। (দেখ কীভাবে) আমি মেঘ থেকে পর্যাণ্ড পানিবর্ষণ করি। জমিনকে করি বিদীর্ণ। উৎপাদন করি খাদ্যশস্য, শাকসবজি, আঙুর, জলপাই, খেজুর, ঘন পত্রপলব শোভিত বাগান, নানাধরনের ফলমূল ও তৃণলতা; তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুদের জন্যে।

৩৩-৩৭. যখন গগনবিদারী ধ্বনির সাথে কেয়ামত হবে, সেদিন প্রত্যেকে নিজের ভাই, মা-বাবা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাইবে। সেদিন প্রত্যেকে শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত-সম্বস্ত হয়ে পড়বে।

৩৮-৩৯. সেদিন অনেক চেহারা হবে আনন্দোচ্ছল, হাস্যোজ্জ্বল, পরিতৃপ্ত ও উপচে পড়া সুখী।

৪০-৪২. এবং অনেক চেহারা হবে বিষণ্ণ মলিন ধূসর ও কালিমাচ্ছন্ন। এরাই সত্য অস্বীকারকারী, পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত।

৮১. সূরা তাকভির

রুকু ১ ॥ আয়াত ২৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

যখন সূর্য অন্ধকারে ঢেকে যাবে ২-১৪. যখন তারকারাজি
নিজেদের আলো হারাবে, যখন পর্বতমালা মরীচিকার ন্যায়
উধাও হবে, যখন পূর্ণ গর্ভবতী উটনী পরিত্যক্ত হবে, যখন
সকল বন্যপশুকে একত্র করা হবে, যখন সমুদ্রের জলরাশি
ক্ষীত হবে, যখন দেহে আবার আত্মা সংযুক্ত হবে, যখন
জীবন্ত কবর দেয়া শিশুকন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী
অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? যখন প্রত্যেকের
আমলনামা দেখানো হবে, যখন আকাশের আবরণ সরানো
হবে, যখন জাহান্নামের আগুন গনগনে লাল করা হবে, যখন
জান্নাতকে দৃশ্যমান করা হবে, সেদিন প্রত্যেকেই জানতে
পারবে, কী পরিণতির জন্যে সে নিজেকে প্রস্তুত করেছে
(বুঝতে পারবে কী করা উচিত ছিল, আর কী করা উচিত
হয় নি)।

১৫-২১. সান্ধী আবর্তনশীল নক্ষত্র, কক্ষপথে দৃশ্যমান
গ্রহসমূহ যা একসময় অদৃশ্য হয়, সান্ধী রাতের অবসানমুহূর্ত
এবং প্রভাতের আগমনকাল। নিশ্চয়ই এই কোরআন
আরশের সার্বভৌম অধিপতির নিকট উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন

সম্মানিত রসুলের মুখনিঃসৃত, যার কথা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য ও মানা উচিত।

২২-২৫. আর (হে মক্কাবাসী!) তোমাদের সাথি পাগল নয়। সে পয়গামবাহক ফেরেশতাকে উজ্জ্বল দিগন্তে স্পষ্ট দেখেছে। গায়েব অর্থাৎ মানবীয় বিচারবুদ্ধির অগম্য বিষয় সম্পর্কে বলার ব্যাপারেও তার কোনো কার্পণ্য নেই। আর এ বাণী কোনো অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়।

২৬-২৯. এরপরও তোমরা কোন পথে যাবে? এ বাণী হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সত্যের দিক-নির্দেশিকা, যারা সরলপথে চলতে চায়। তবে (ক্রমাগত পাপাচারে লিপ্ত থাকলে) তোমাদের সদিচ্ছা (কখনো) জাগ্রত হবে না, যদি না মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ (বিশেষভাবে) ইচ্ছা করেন।

৮২. সূরা ইনফিতার

রুকু ১ ॥ আয়াত ১৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ২-৫. যখন তারকারাজি
বিক্ষিপ্তভাবে ছিটকে পড়বে, যখন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস সব
ভাসিয়ে নেবে, যখন কবরসমূহ উন্মুক্ত হবে (অর্থাৎ যখন
চেনা পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে পরকালের বাস্তবতা শুরু হবে) তখন
প্রত্যেকেই জানতে পারবে তার কৃতকর্ম—কী সে সাথে নিয়ে
এসেছে, আর কী দুনিয়ায় রেখে গেছে।

৬-৮. হে মানুষ! কীসের মোহ তোমাকে বিভ্রান্ত করল
তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে? তিনি তোমাকে
সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন (করেছেন প্রয়োজনীয়
যোগ্যতা ও গুণাবলিতে সমৃদ্ধ)। তিনি তোমাকে তাঁর
পছন্দমতো আকৃতিতে গঠন করেছেন।

৯-১২. (হে মানুষ!) তোমরা (পার্থিব বিলাসিতায়) মোহাচ্ছন্ন
হয়ে কর্মফল দিবসকে মিথ্যা মনে করছ। আসল সত্য হচ্ছে,
তোমরা যা করো তার সবকিছুই রেকর্ড করার জন্যে রয়েছে
সম্মানিত লেখকবৃন্দ।

১৩-১৬. নিঃসন্দেহে সত্যানুসারীরা থাকবে পরম
সুখস্বাচ্ছন্দ্যে, পাপাচারীরা থাকবে জাহান্নামে। কর্মফল
বাংলা মর্মবাণী

দিবসেই তারা সেখানে প্রবেশ করবে। সেখানে অনুপস্থিত থাকার কোনো সুযোগ কারো থাকবে না।

১৭. কর্মফল দিবস সম্পর্কে কীভাবে তুমি ধারণা করবে?

১৮. আবার জিজ্ঞেস করি, কর্মফল দিবস সম্পর্কে কীভাবে তুমি ধারণা করবে?

১৯. আসলে এটা সেই দিন, যেদিন কোনো মানুষ কারো জন্যে কিছু করতে পারবে না। সেদিন সার্বভৌম কর্তৃত্ব হবে শুধু আল্লাহর।

৮৩. সূরা মুতাফফিফিন

রুকু ১ ॥ আয়াত ৩৬ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

সর্বনাশ হবে ওদের, যারা ওজন বা মাপে কম দেয়।

২-৩. ওরা নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয় কিন্তু দেয়ার সময় মাপে বা ওজনে কারচুপি করে কম দেয়।

৪-৬. ওরা কি চিন্তা করে না যে, ওদের পুনর্জীবিত করা হবে! আর সেই পুনরুত্থান দিবসে মহাবিশ্বের প্রতিপালকের সামনে সমস্ত মানুষ হাজির হবে (এবং প্রতিটি কাজের জবাবদিহি করতে হবে)।

৭-৯. নিশ্চয়ই পাপীদের আমলনামা হবে ‘সিজ্জিন’। তুমি কি জানো ‘সিজ্জিন’ কী? এটা হচ্ছে অমোচনীয়ভাবে লিপিবদ্ধ আমলনামা।

১০-১৩. সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে এটি হবে দুর্ভোগের দিন। ওরা কর্মফল দিবসকে অসত্য মনে করেছিল, আসলে শুধু সীমালঙ্ঘনকারী পাপিষ্ঠরাই কর্মফল দিবসকে অসত্য মনে করে। ওদের নিকট আমার বাণী শোনানো হলে ওরা বলে, ‘এ-তো পুরনো দিনের কল্পকাহিনী!’

১৪. আসলে ওরা মিথ্যায় ডুবে আছে। ওদের পাপ ওদের অন্তরে মিথ্যার আস্তর সৃষ্টি করেছে।

১৫-১৭. নিশ্চয়ই সেদিন ওরা ওদের প্রতিপালকের করুণা থেকে বঞ্চিত থাকবে। এরপর ওদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর ওদের বলা হবে, এই সেই জাহান্নাম, যা তোমরা ‘কল্লকাহিনী’ মনে করতে।

১৮-২১. অবশ্যই সৎকর্মশীলদের আমলনামা হবে ‘ইলিইন’। তুমি কি জানো এই ‘ইলিইন’ সম্পর্কে? এ হচ্ছে স্বমহিমায় উজ্জ্বল আমলনামা। আল্লাহর নৈকট্যাভকারী ফেরেশতারা এই এর সংরক্ষক।

২২-২৮. নিঃসন্দেহে সৎকর্মশীলরা আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতলাভে ধন্য হবে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে চারপাশের সৌন্দর্য ও প্রাচুর্য উপভোগ করবে। তাদের চেহারা সমুজ্জ্বল হবে শান্তি-সুখের আভায়। তারা পান করবে স্বর্গীয় ঝর্ণাধারা তাসনিমের মিশ্রণে সমৃদ্ধ ‘মিশকে আম্বর’ দ্বারা মোহরকৃত অফুরন্ত তৃপ্তির উৎস পবিত্র পানীয়। আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তরাই এ সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। অতএব যারা বিজয়ী হতে চাও, সৎকর্মে (নিজের সাথে) প্রতিযোগিতা করো।

২৯-৩২. সত্য অস্বীকারকারী পাপীরা দুনিয়ায় বিশ্বাসীদের উপহাস করত। তাদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় চোখ-ইশারা করে কটাক্ষ করত। ঘরে ফিরে এসে আপনজনদের

কাছে বিশ্বাসীদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করত। বিশ্বাসীদের দেখলে ওরা বলত, ‘এরা আসলেই উচ্ছন্ন গেছে!’

৩৩. অথচ ওদেরকে তো বিশ্বাসীদের অভিভাবকত্ব করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় নি।

৩৪-৩৬. হাঁ! আজ বিশ্বাসীদের পালা। সুসজ্জিত আসনে বসে সত্য অস্বীকারকারীদের অবস্থা অবলোকন করে তারা বলছে, ওরা কি ওদের কাজের যথাযথ প্রতিফল পাচ্ছে না?

৮৪. সূরা ইনশিকাক

রুকু ১ ॥ আয়াত ২৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

নিজ প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করে যথার্থ কর্তব্য হিসেবে যখন আকাশ ফেটে চৌচির হবে ৩-৫. আর যখন জমিন প্রসারিত হয়ে যথার্থ কর্তব্য হিসেবে নিজ প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করে গর্ভস্থ সবকিছু উদ্গীরণ করে গর্ভশূন্য হবে (তখন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে)।

৬. হে মানুষ! পার্থিব জীবনের সকল দুঃখকষ্ট অতিক্রম করেই একদিন তুমি তোমার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবে।

৭-৯. সেদিন যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাবনিকাশ হবে খুবই সহজ। সে তার প্রিয়জনদের কাছে আনন্দিতচিত্তে ফিরে যাবে।

১০-১৫. সেদিন যার আমলনামা পেছন দিক থেকে দেয়া হবে, সে তখন মৃত্যুকামনা করবে। আর সে ঝলসাতে থাকবে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। দুনিয়ায় সে তার স্বজনদের সাথে আনন্দেই ছিল। তখন সে ভাবত, কোনোদিনই তাকে আলাহর কাছে ফিরে যেতে হবে না। নিশ্চয়ই সে আল্লাহর

কাছে ফিরে যাবে, তার প্রতিপালক তার সব কাজকর্মই পর্যবেক্ষণ করছেন।

১৬-১৯. তাকাও গোধূলিলগ্নের দিকে, ভাবো রাত নিয়ে এবং যা-কিছু তা ধাপে ধাপে প্রকাশ করে; তাকাও চাঁদের দিকে যখন তা ষোলকলায় পূর্ণ হয়। নিশ্চয়ই তোমরা অস্তিত্বের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে প্রবেশ করবে।

২০-২১. ওদের কী হয়েছে যে, এরপরও ওরা (পরকালে) বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং ওদের সামনে যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন সেজদা করে না? [সেজদা]

২২-২৩. আশ্চর্য! সত্য অস্বীকারকারীরা পরকালকে অস্বীকার করে। অথচ ওদের হৃদয়ে লুকানো সবকিছুই আল্লাহ ভালোভাবে জানেন।

২৪-২৫. সুতরাং (হে নবী!) ওদের কঠিন শাস্তির সংবাদ দাও। কিন্তু এর মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

৮৫. সূরা বুরাজ

রুকু ১ ॥ আয়াত ২২ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও রাশিমালা শোভিত আকাশে! ২-৩. চিন্তা করো প্রতিশ্রুত কর্মফল দিবসে (তোমার অবস্থান নিয়ে)। ভাবো তাঁকে নিয়ে, যিনি সবকিছুর সাক্ষ্যদাতা এবং সকল সাক্ষ্যের উৎস।

৪-৫. বিশ্বাসীদের পুড়িয়ে মারার জন্যে যারা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে, তারা আসলে নিজেরাই নিজেদের আগুনে পুড়ে মরে।

৬-৯. প্রজ্বলিত কুণ্ডের কাছে বসে সত্য অস্বীকারকারীরা সচেতনভাবেই বিশ্বাসীদের ওপর নির্যাতন উপভোগ করে। বিশ্বাসীদেরকে নির্যাতন করার একটিমাত্র কারণ হচ্ছে যে, বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে আল্লাহকে, যিনি সকল প্রশংসার মালিক, মহাপরাক্রমশালী। মহাকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব শুধু তাঁর। আর আল্লাহ সবকিছুই দেখছেন।

১০. যারা বিশ্বাসী নরনারীর ওপর জুলুম-নির্যাতন করার পর অনুশোচনা বা তওবা করে নি, তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে জাহান্নামের আজাব, অশ্রুভেদী দহনযন্ত্রণা।

১১. আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান বর্ণাধারা। আর আসল সাফল্য এটাই।

১২. নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালকের সামনে জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া একেবারেই নিশ্চিন্দ।

১৩. মনে রেখো, তিনি মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তাকে পুনর্জীবিত করবেন।

১৪-১৬. তিনি পরম ক্ষমালীল, প্রেমময়। তিনি আরশের অধিপতি, মহামহান। তিনি নিজ ইচ্ছানুসারেই সবকিছু করেন।

১৭-১৮. তুমি কি ফেরাউন ও সামুদের সেনাদলের পরিণতির খবর জানো না?

১৯-২০. এরপরও সত্য অস্বীকারকারীরা ক্রমাগত মিথ্যাচারে লিপ্ত। অথচ আল্লাহর ক্ষমতার বেষ্টিণীর মধ্যেই ওরা রয়েছে।

২১-২২. (ওরা আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলেও) মহিমাম্বিত কোরআন লিপিবদ্ধ আছে সুরক্ষিত ফলকে— লাওহে মাহফুজে।

৮৬. সূরা তারেক

রুকু ১ ॥ আয়াত ১৭ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও আকাশে! দেখ রাতে যা আবির্ভূত হয়! ২-৪. তুমি কি ধারণা করতে পারো, রাতে যা আবির্ভূত হয়, তা কী? আসলে এ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যা (জীবনের) অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে। আসলে কোনো মানুষকেই জবাবদিহিতার আওতার বাইরে রাখা হয় নি।

৫-৮. সুতরাং হে মানুষ! তোমার ভাবা উচিত তোমাকে কী প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবগে নিষ্কিণ্ত তরল দ্রব্য থেকে, যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বাঁকানো হাড়ের মধ্য থেকে। নিঃসন্দেহে (যিনি তাকে এভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন) তিনি পুনরায় তাকে সৃষ্টি করতে সক্ষম।

৯-১০. জবাবদিহিতার দিন সকল গোপন বিষয়ই প্রকাশ করা হবে এবং তখন মানুষের কিছু করার শক্তি থাকবে না আর সে সাহায্যের জন্যেও কাউকে পাবে না।

১১-১২. তাকাও নভোমণ্ডলের দিকে যা ক্রমাগত বিবর্তনশীল, তাকাও জমিনের দিকে যা প্রতিনিয়ত বিদীর্ণ হচ্ছে উদ্ভিদে।

১৩-১৪. নিশ্চয়ই কোরআন আল্লাহর বাণী—সত্য-মিথ্যার মীমাংসাকারী, এটি কোনো কল্পকাহিনী বা বিনোদনের বিষয় নয়।

১৫-১৬. (মক্কার) সত্য অস্বীকারকারীরা মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আর আমিও প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি।

১৭. অতএব (হে নবী!) এই সত্য অস্বীকারকারীদের একটু অবকাশ দাও, কিছু সময়ের জন্যে ওরা লিপ্ত থাকুক ওদের ষড়যন্ত্রে।

৮৭. সূরা আ'লা

রুকু ১ ॥ আয়াত ১৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হে নবী!) তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। ২-৫. তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও প্রতিটি জিনিসের প্রয়োজনীয় আকৃতি দিয়েছেন। তিনি প্রতিটি সৃষ্টির প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন, গন্তব্যে পৌঁছার জন্যে পথনির্দেশনা দিয়েছেন (অর্থাৎ বিকাশধারা ও পরিণতির প্রাকৃতিক আইন তৈরি করেছেন)। তিনি সবুজ তৃণে জমিন আচ্ছাদিত করেন, আবার তা ধূসর খড়কুটায় পরিণত করেন।

৬-৮. (হে নবী!) আমি তোমাকে কোরআন এমনভাবে আত্মস্থ করাব যে, আল্লাহ যা চাইবেন তা ছাড়া কোনোকিছুই তুমি ভুলবে না। মানুষের জানার জন্যে যা উন্মুক্ত এবং যা তার বুদ্ধির অগম্য—এ সবকিছুই আল্লাহ ভালো জানেন। এভাবে আমি তোমার জন্যে শান্তির সরলপথকে আরো সহজ করে দেবো।

৯-১৩. (অতএব হে নবী!) তুমি উপদেশ দাও, সত্যের বাণী সবার কাছে পৌঁছে দাও। সচেতন ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে।

আর যে (তার সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করে) সত্যকে উপেক্ষা করবে, তার নিয়তি হবে ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড। সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না (শুধু পুড়তে থাকবে)।

১৪-১৫. নিশ্চয়ই যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সবসময় প্রতিপালককে স্মরণ করে এবং নামাজ কায়েম করে, সে ব্যক্তিই সুখী ও সফল।

১৬-১৯. (কিন্তু হে মানুষ!) এত কিছু জানার পরও তোমরা পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দাও, অথচ পরকালই স্থায়ী ও মহাকল্যাণময়। (শুধু কোরআনেই নয়) ইব্রাহিম ও মুসার কিতাবসহ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এ কথাই বলা হয়েছে।

৮৮. সূরা গাশিয়াহ

রুকু ১ ॥ আয়াত ২৬ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হে নবী!) তোমার নিকট কেয়ামতের বিবরণ এসে পৌঁছেছে কি?

২-৭. সেদিন অনেকের চেহারা হবে অবনত, ভীতসন্ত্রস্ত, ক্লাস্তক্লিষ্ট। ওরা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। ওদের পান করতে দেয়া হবে টগবগে ফুটন্ত পানি। ওদের খাবার হবে কাঁটায়ুক্ত শুকনো ঘাস, যা থেকে ওরা না পাবে পুষ্টি, না মিটবে ওদের ক্ষুধা।

৮-১৬. সেদিন অনেক চেহারা হবে আনন্দোজ্জ্বল, অর্জনে পরিতৃপ্ত। তারা প্রবেশ করবে সুখ-উপচানো জান্নাতে। সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শুনবে না। সেখানে থাকবে প্রবহমান বর্ণাধারা, সুসজ্জিত উচ্চাসন, মনোহর পানপাত্র, সারি সারি ঠেস-বালিশ, সুকোমল বর্ণিল বিছানা।

১৭. কেয়ামত অস্বীকারকারীরা কি তাকায় না বৃষ্টিগর্ভা মেঘমালার দিকে—কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?

১৮. ওরা কি তাকায় না আকাশের দিকে—কীভাবে তা সমুন্নত রাখা হয়েছে?

১৯. এবং পর্বতমালার দিকে—কীভাবে তা সুদৃঢ় করা হয়েছে?

২০. এবং জমিনের দিকে—কীভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে?

২১-২২. অতএব হে নবী! তুমি ওদের উপদেশ দাও। তুমি বাণীবাহক মাত্র। ওদের বিশ্বাস ও কর্মের নিয়ন্ত্রক নও।

২৩-২৪. অবশ্যই যে এ বাণীকে উপেক্ষা করবে এবং সত্য অস্বীকার করবে, আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

২৫-২৬. অবশ্যই ওদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে এবং সকল কাজের হিসাব দিতে হবে আমারই কাছে।

৮৯. সূরা ফজর

রুকু ১ ॥ আয়াত ৩০ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও উষালগ্নে। ২-৫. ভাবো দশ রাতের বিষয়ে, চিন্তা করো বহু ও এক নিয়ে, দৃষ্টিপাত করো রাতের আঁধার যখন বিদায় নিতে শুরু করে। এ সবকিছু বিবেচনা করার পর সহজাত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির জন্যে সত্যের সপক্ষে আর কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে কি?

৬-১৪. তুমি কি দেখ নি, তোমার প্রতিপালক সুউচ্চ স্তম্ভের নির্মাতা আদ বংশের ইরাম গোত্রের কী পরিণতি করেছিলেন, যাদের সমতুল্য নির্মাতা এর আগে কোথাও সৃষ্টি করা হয় নি? আর সামুদ জাতির পরিণতিও কী হয়েছিল, যারা কোরা উপত্যকায় পাথর কেটে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল? আর বহু সেনাশিবিরের অধিপতি ফেরাউনের পরিণতি? ওরা সীমালঙ্ঘন করেছিল। পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। এরপর তোমার প্রতিপালক ওদের ওপর আজাবের কষাঘাত হানলেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সবদিকে দৃষ্টি রাখেন।

১৫-১৬. আসলে মানুষের অবস্থা এই যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করার জন্যে সম্মান ও প্রাচুর্য দান

করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক (সঙ্গত কারণেই) আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করার জন্যে রিজিক সংকুচিত করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অসম্মান করেছেন।

১৭-২০. না, একথা সত্য নয়। আসলে (এটা তোমাদের কর্মফল) তোমরা এতিমের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করো না, অভাবী অসহায়কে অনুদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না, অন্যের উত্তরাধিকারের সম্পদ নিজেরা আত্মসাৎ করো, আর ধনসম্পত্তির প্রতি তোমাদের আকর্ষণ আসক্তিতে পরিণত হয়েছে।

২১-২৩. আসলে এই আচরণ সঙ্গত নয়। যখন জমিনকে চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে, যখন কাতারে কাতারে ফেরেশতাদের আসল প্রকৃতি উদ্ভাসিত হবে এবং তোমাদের প্রতিপালকের মহিমা তোমাদের সামনে সমুজ্জ্বল হবে এবং জাহান্নামকে সবার সামনে দৃশ্যমান করা হবে, সেদিন মানুষ আসল সত্যকে (অর্থাৎ কী কাজ করা উচিত ছিল আর কোন কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল তা) উপলব্ধি করবে। কিন্তু তখন তার উপলব্ধি কোন কাজে লাগবে?

২৪-২৬. সেদিন সে বলবে, ‘হায়! আমার পরকালীন জীবনের জন্যে যদি আগে থেকেই কিছু সংকর্ম করে রাখতাম!’ সেদিন আব্বাহ অন্যায়কারীদের যে শাস্তি দেবেন,

এমন কঠিন শাস্তি আর কেউ দিতে পারবে না। আর তাঁর মতো শক্ত বাঁধনে বাঁধারও কেউ থাকবে না।

২৭-৩০. (অপরদিকে সৎকর্মশীলদের বলা হবে) হে প্রশান্তচিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো। তোমরা আজ তৃপ্ত। আমিও তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট। আমার অন্য নেক বান্দাদের মধ্যে शामिल হও। প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।

৯০. সূরা বালাদ

রুকু ১ ॥ আয়াত ২০ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

সাক্ষী এই পবিত্র ভূমি। ২. এখানে বসবাসের ব্যাপারে তুমি স্বাধীন! ৩. সাক্ষী জনক ও জাতক!

৪. নিশ্চয়ই আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।

৫-৭. সে কি মনে করে, (অন্যায় ও পাপাচার করলেও) তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না? সে বলে, আমি প্রচুর অর্থ উড়িয়ে দিয়েছি। সে কি মনে করে, কেউ তা দেখে নি?

৮-১১. আমি কি তাকে দুটি চোখ, জিহ্বা ও ঠোঁট দেই নি? আমি কি তাকে (ধর্ম ও অধর্মের) দুটি পথ দেখাই নি? কিন্তু সে 'ধর্মের দুর্গে' প্রবেশ করে নি।

১২-১৮. তুমি কি জানো ধর্মের দুর্গ কী? ধর্মের দুর্গ (নেক আমল বা সৎকর্মের সুউচ্চ স্তর) হচ্ছে (এক) দাসমুক্তি (অর্থাৎ একজন মানুষকে মনোজাগতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক—সকল ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা), (দুই) দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান, (তিন) নিকটবর্তী

এতিম বা ধূলিমলিন মিসকিন-অসহায়কে লালন এবং (চার) বিশ্বাসীদের সাথে সজ্জবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে বিশ্বজনীন মমতা ও সবরে (অর্থাৎ পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্যে নিরলস প্রচেষ্টা ও আত্মসংযমে) উদ্বুদ্ধ করা। এরাই সফলকাম।

১৯-২০. আর যারা এ নির্দেশ অস্বীকার করে (নিজের খেয়ালখুশিমতো চলে) তারাই ব্যর্থ! গনগনে আগুন ওদের গ্রাস করবে।

৯১. সূরা শামস

রুকু ১ ॥ আয়াত ১৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও সূর্য ও এর উজ্জ্বল কিরণের দিকে। ২-৬. তাকাও চাঁদের দিকে যখন তা সূর্যের আলোর প্রতিফলন ঘটায়। ভাবো দিন নিয়ে, যখন তা পৃথিবীর সবকিছুকে দৃশ্যমান করে। আর ভাবো রাতের কথা, যখন তা সবকিছুকে আঁধারে ঢেকে দেয়। তাকাও নভোমণ্ডলের দিকে, ভাবো এর নির্মাতার বিস্ময়কর নির্মাণশৈলী নিয়ে! তাকাও জমিনের দিকে, ভাবো তাঁর কথা, যিনি একে বিস্তীর্ণ ও বৈচিত্র্যে বর্ণিল করেছেন।

৭-৮. তাকাও মানবীয় প্রকৃতি ও সত্তার দিকে (মন ও প্রবৃত্তির দিকে), যাকে প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। তারপর তাকে ভালো ও মন্দ কাজের (পাপ-পুণ্যের) সমস্ত জ্ঞান দান করা হয়েছে।

৯-১০. অতএব যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে সে-ই সফল। আর যে নিজেকে কলুষিত করেছে সে-ই ব্যর্থ।

১১-১৫. সামুদ্র সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত সীমালঙ্ঘন করল। ওদের সবচেয়ে দুষ্ট ও হতভাগ্য ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে

উঠলে আল্লাহর রসুল ওদের বলল, সাবধান! আল্লাহর উটনীকে পানি পান করতে বাধা দিও না। কিন্তু ওরা রসুলকে অস্বীকার করল ও উটনীকে নির্মমভাবে হত্যা করল। ওদের পাপের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ পুরো জনপদকে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন। আসলে পাপের পরিণতি সম্পর্কে কোনো ভয়ই ওদের কারো মধ্যে ছিল না।

৯২. সূরা লাইল

রুকু ১ ॥ আয়াত ২১ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

ভাবো রাত নিয়ে, যা পৃথিবীকে আঁধারে ছেয়ে ফেলে।

২. ভাবো দিন নিয়ে, যা সবকিছুকে দৃশ্যমান করে।

৩. ভাবো নর ও নারীর সৃষ্টি নিয়ে (প্রতিটি সৃষ্টির মাঝের বৈপরীত্য ও পরিপূরকতা নিয়ে)।

৪. নিশ্চয়ই (হে মানুষ!) তোমাদের লক্ষ্যের মাঝে রয়েছে বিস্তার পার্থক্য!

৫-৭. অতএব কেউ যদি দান করে, আল্লাহ-সচেতন হয় এবং ভালো ও কল্যাণকর বিষয়গুলোকে জীবনের সত্য হিসেবে গ্রহণ করে, তবে আমি সাফল্যের সরলপথে চলাকে তার জন্যে সহজ করে দেবো।

৮-১১. আর কেউ যদি কৃপণতা করে, স্রষ্টাবিমুখ হয় এবং চিরায়ত ভালো ও সত্যকে অস্বীকার করে, তবে আমি তার জন্যে দুঃখকষ্ট ও ধ্বংসের পথে চলাকে সহজ করে দেবো। কবরে গেলে ধনসম্পত্তি তার কোন কাজে লাগবে?

১২-১৩. মনে রেখো, আমি করুণাবশত তোমাদের সত্যপথ প্রদর্শন করছি। আমি ইহকাল ও পরকালের মালিক।

১৪-১৬. তাই আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি লেলিহান অগ্নিকুণ্ড সম্পর্কে। যারা সত্যকে অস্বীকার করবে, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, শুধু সেই হতভাগারাই সেখানে প্রবেশ করবে।

১৭-২১. আর যারা আল্লাহ-সচেতন এবং কারো কাছ থেকে প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই শুধু মহান প্রতিপালকের সম্ভৃতি ও আত্মশুদ্ধির জন্যে নিজ সম্পত্তি থেকে দান করে, তারা লাভ করবে অফুরন্ত তৃপ্তি ও সন্তোষ।

৯৩. সূরা দোহা

রুকু ১ ॥ আয়াত ১১ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

ভাবো সকালের সোনালি আলো ২. আর রাতের নিকষ
অন্ধকার নিয়ে ।

৩-৫. (হে নবী!) তোমার প্রতিপালক কখনো তোমাকে ত্যাগ
করেন নি। না তিনি কোনো ব্যাপারে তোমার ওপরে
অসম্ভুষ্ট। নিঃসন্দেহে তোমার পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে পরবর্তী
সময় অনেক ভালো। অচিরেই তোমার প্রভু তোমাকে এমন
নেয়ামত দান করবেন, যাতে তুমি পরিতৃপ্ত হবে।

৬-৮. তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পান নি এবং
তারপর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নি? পথহারা অবস্থা
থেকে তিনি কি তোমাকে সত্যপথের সন্ধান দেন নি? নিঃস্ব
অবস্থা থেকে তিনি কি তোমাকে অভাবমুক্ত করেন নি?

৯-১০. অতএব তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না।
কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে তিরস্কার কোরো না।

১১. আর সবসময় তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের
অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করতে থাকো।

৯৪. সূরা ইনশিরাহ

রুকু ১ ॥ আয়াত ৮ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হে নবী!) আমি কি তোমার হৃদয় প্রশস্ত করে দেই নি?
২-৪. আমি কি তোমার ওপর থেকে দুর্বহ বোঝার ভার
অপসারণ করি নি? আমি কি তোমার মর্যাদাকে সমুন্নত
করি নি?

৫-৬. মনে রেখো, প্রতিটি কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি!
নিঃসন্দেহে প্রতিটি কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি! [অর্থাৎ
প্রতিটি সমস্যার ভেতরেই রয়েছে তার সমাধান, প্রতিটি
সমস্যার ভেতরেই রয়েছে নতুন সম্ভাবনা।]

৭-৮. অতএব (তুমি দৃঢ়তার সাথে কাজ করো আর) যখনই
সময় পাও প্রতিপালকের কাছে একান্তভাবে নিমগ্ন হও।

৯৫. সূরা ত্বীন

রুকু ১ ॥ আয়াত ৮ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও ডুমুর ও জয়তুনের দিকে। ২-৩. তাকাও সিনাই উপত্যকার তুর পাহাড় আর নিরাপদ নগরীর দিকে।

৪-৫. আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম (দৈহিক ও মানসিক গুণাবলির) অবকাঠামোয়। (কিন্তু সত্য অস্বীকার ও অপকর্ম করলে) আমি তাকে পৌছে দেই হীনতা ও পঙ্কিলতার সর্বনিম্ন স্তরে।

৬. আর যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত নেয়ামত।

৭. অতএব (হে মানুষ!) কেন তোমরা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করবে?

৮. আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

৯৬. সূরা আলাক

রুকু ১ ॥ আয়াত ১৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

পড়ো! তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে। ২-৫. যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিষিক্ত ডিম্ব থেকে। পড়ো! তোমার প্রতিপালক মহান দয়ালু। তিনি মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন কলমের। আর মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।

৬-৮. অথচ মানুষ যখনই নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করতে শুরু করে, তখনই সে সীমালঙ্ঘন করে। কিন্তু মনে রেখো, প্রত্যেককে অবশ্যই তার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে।

৯-১০. (হে নবী!) তুমি কি এমন ব্যক্তির পরিণতি নিয়ে চিন্তা করেছ, যে আল্লাহর কোনো বান্দাকে নামাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে?

১১-১২. কেউ সঠিক পথে বা আল্লাহ-সচেতনতার পথে চললে তাকে বাধা দেয়া কি তুমি উচিত মনে করো?

১৩. তুমি কি মনে করো না যে, এর ফলে সে সত্যকে অস্বীকার করেছে এবং সত্যবিমুখ হচ্ছে?

১৪. তবে কি সে জানে না যে, আল্লাহ সবকিছু দেখছেন?

১৫-১৬. সাবধান! সে যদি সত্যবিরোধিতা থেকে বিরত না হয়, তবে আমি এই মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠের মাথার সামনের চুলের মুঠি ধরে টেনেহিঁচড়ে নেয়ার ব্যবস্থা করব।

১৭-১৮. (সেদিন যদি সামর্থ্য থাকে) তবে সে সাহায্যের জন্যে ডাকুক ওর সঙ্গীসাথীদের। আর আমি শুধু নির্দেশ দেবো আজাবের ফেরেশতাদের।

১৯. না, কখনো নয়, ওর কথায় কান দিও না। সেজদা করো আর আল্লাহর নৈকট্যলাভে সচেষ্ট হও! [সেজদা]

৯৭. সূরা কদর

রুকু ১ ॥ আয়াত ৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

নিশ্চয়ই আমি কোরআন নাজিল করেছি কদরের রাতে ।

২. তুমি কি জানো কদরের রাত কী?

৩. কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও সেরা ।

৪. এ রাতে রুহ ও ফেরেশতারা নেমে আসে প্রতিপালকের
অপার অনুগ্রহ নিয়ে ।

৫. উষালগ্ন পর্যন্ত বর্ষণ করে সমস্ত অকল্যাণ থেকে
নিরাপত্তা ও শান্তি ।

৯৮. সূরা বাইয়েনাহ

রুকু ১ ॥ আয়াত ৮ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হে নবী!) পূর্বতন কিতাবি ও শরিককারীদের একটি অংশ সত্য অস্বীকার করার ব্যাপারে যত অনমনীয় হোক না কেন, তাদের কাছে সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ না পৌঁছানো পর্যন্ত তারা পরিত্যক্ত হতে পারে না।

২-৩. তাই আল্লাহর কাছ থেকে একজন রসুল এসে তাদের কাছে পেশ করল শাস্ত্রত সত্য বিধিবিধানসম্বলিত পবিত্রবাণী।

৪. সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর পূর্ববর্তী কিতাবিরা এই প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল।

৫. অথচ তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল শাস্ত্রত সত্যের। সকল মিথ্যা পরিত্যাগ করে বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদত করো, নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো। আর এটাই সত্য সঠিক চিরায়ত ধর্মবিধান বা নৈতিক বিধিবিধান।

৬. নিশ্চয়ই (সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পরও) পূর্ববর্তী কিতাবি ও শরিককারীদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকারে অনড় থাকবে,

তারা জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সেখানেই থাকবে চিরকাল। নিশ্চয়ই ওরা সৃষ্টির অধম।

৭. আর নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্মশীল, তারা সৃষ্টির সেরা।

৮. এরা মহান প্রতিপালকের কাছ থেকে পাবে তাদের সৎকর্মের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান বর্ণাধারা, তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ। এই পরিতৃপ্তি তো তাদের জন্যে, যারা আল্লাহ-সচেতন ও আল্লাহর (বিরাগভাজন হওয়াকে) ভয় করে।

৯৯. সূরা জিলজাল

রুকু ১ ॥ আয়াত ৮ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

পৃথিবী যখন ভয়াবহ কম্পনে প্রকম্পিত হবে ২-৩. আর
জমিন যখন তার ভেতরের সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে,
তখন মানুষ বলে উঠবে, ‘এর এ কী হলো?’

৪-৫. সেদিন প্রতিপালকের নির্দেশে জমিন তার বুকের ওপর
সজ্জাটিত সমস্ত ঘটনা বয়ান করবে।

৬. সেদিন সকল মানুষ এক এক করে আলাদাভাবে উপস্থিত
হবে এবং পৃথিবীতে সে যা করেছে তার প্রতিটি কাজ তাকে
দেখানো হবে।

৭. যে পৃথিবীতে অণুপরিমাণ সৎকর্ম করেছে, সে তা দেখতে
পাবে।

৮. আর যে অণুপরিমাণ অন্যায় করেছে, সে তা-ও দেখবে
(সুস্পষ্টভাবে)।

১০০. সূরা আদিয়াত

রুকু ১ ॥ আয়াত ১১ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও যারা উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান ২-৫. যাদের পদাঘাতে
স্কুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, যারা অভিযান চালায় উষালগ্নে,
উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে আঁধারে আচ্ছন্ন করে দিগন্ত, (অন্ধভাবে)
টুকে পড়ে ভিড়ের মধ্যে (তছনছ করে সবকিছু নিজের
স্বার্থে)।

৬-৮. আসলে মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ।
আর সে নিজেই এর সাক্ষী। কারণ সে ধনসম্পত্তির
আসক্তিতে নিমজ্জিত।

৯-১১. কিন্তু সে কি জানে না যে, কেয়ামতের দিন কবর
থেকে সবার পুনরুত্থান ঘটবে এবং সবার অন্তরে লুকানো
সবকিছু প্রকাশ করা হবে? অবশ্য তাদের প্রতিপালক যে
তাদের ব্যাপারে সবকিছু অবহিত ছিলেন, সেদিন তা
তারা বুঝবে!

১০১. সূরা ক্বারিয়াহ

রুকু ১ ॥ আয়াত ১১ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হঠাৎ) মহাপ্রলয়! ২-৩. কী (ভয়াবহ) মহাপ্রলয়! তুমি কি ধারণা করতে পারো মহাপ্রলয় কী?

৪-৫. সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো চারদিকে বিক্ষিপ্ত হবে। পর্বতমালা উড়ে যাবে পেঁজা পেঁজা ধূনা তুলার মতো।

৬-৭. তখন সৎকর্মে যার পাল্লা ভারী হবে, সে অনন্ত সুখে অবগাহন করবে।

৮-৯. আর সৎকর্মে যার পাল্লা হালকা হবে, তার নিবাস হবে হাবিয়া। ১০. তুমি কি জানো হাবিয়া কী?

১১. হাবিয়া হচ্ছে (সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক) অগ্নিকুণ্ড।

১০২. সূরা তাকাসুর

রুকু ১ ॥ আয়াত ৮ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(অপরের তুলনায়) বেশি সুখসম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে আমৃত্যু মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।

৩-৪. আসলে এটা ঠিক নয়, সময় এলেই তা জানতে পারবে। আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটা ঠিক নয়, সময় এলেই তা জানতে পারবে।

৫. (সত্য সম্পর্কে) নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে তোমরা কখনোই মোহাচ্ছন্ন হতে না।

৬-৮. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে। আবার বলছি, তোমরা অবশ্যই নিজ চোখে জাহান্নাম দেখবে। তোমরা নিশ্চিত থাকো, সেদিন তাঁর দেয়া নেয়ামত দিয়ে তোমরা কী করেছ, সে-সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

১০৩. সূরা আসর

রুকু ১ ॥ আয়াত ৩ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

সময়ের শপথ! (তাকাও মহাকালের দিকে। তাহলেই বুঝতে পারবে) ২-৩. বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল ছাড়া প্রতিটি মানুষ অবশ্যই ক্ষতিতে নিমজ্জিত। বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলরা সম্ভবদ্বাৰা পরস্পরকে সত্যের পথে উদ্বুদ্ধ করে। আর (প্রতিকূলতার মুখে) ধৈর্যের (সাথে পরিস্থিতি পরিবর্তন ও আত্মশুদ্ধির জন্যে নিরলস প্রয়াস চালানোর) উপদেশ দেয়।

১০৪. সূরা হুমাজাহ

রুকু ১ ॥ আয়াত ৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে সামনাসামনি দুর্ব্যবহার করে এবং পেছনে নিন্দা করে।

২. (দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে) যে (কৃপণের মতো) অর্থ জমায় আর বার বার তা গণনা করে এবং একে নিজের রক্ষাকবচ মনে করে।

৩. সে মনে করে তার অর্থ তাকে অনন্তকাল বাঁচিয়ে রাখবে।

৪. না, কখনো নয়। সে-তো (পরকালে) ‘হুতামা’য় নিষ্কিণ্ত হবে। ৫. তুমি কি জানো ‘হুতামা’ কী?

৬-৯. হুতামা হচ্ছে বিশাল প্রজ্জ্বলিত চুলি, যার আগুন হৃদয়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দহন করবে। বিশাল স্তম্ভসমূহ পরিবেষ্টিত চুলির মুখও ঢেকে দেয়া হবে (দহনযন্ত্রণাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্যে)।

১০৫. সূরা ফীল

রুকু ১ ॥ আয়াত ৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হে নবী!) তুমি কি জানো না, হস্তিবাহিনীকে তোমার
প্রতিপালক কীভাবে পর্যুদস্ত করেছিলেন?

২. তিনি কি ওদের চক্রান্ত পুরোপুরি ব্যর্থ করে দেন নি?

৩-৫. তিনি হস্তিবাহিনীর মোকাবেলায় পাঠালেন ঝাঁকে ঝাঁকে
পাখি আর ওরা নিক্ষেপ করল কঙ্কর। পরিণামে হস্তিবাহিনী
মাটিতে মিশে গেল পশুর চিবানো ভূষির মতো।

১০৬. সূরা কোরাইশ

রুকু ১ ॥ আয়াত ৪ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

অতএব কোরাইশদের নিরাপত্তার জন্যে ২-৩. শীত-গ্রীষ্মের
বাণিজ্যযাত্রায় নিরাপদ থাকার জন্যে, তাদের উচিত
কাবাঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করা।

৪. তিনিই তাদের ক্ষুধার আহার দিয়েছেন, নিরাপত্তা
দিয়েছেন ভয়ভীতি হতে।

১০৭. সূরা মাউন

রুকু ১ ॥ আয়াত ৭ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হে নবী!) তুমি কি কখনো চিন্তা করেছ, কোন ধরনের লোকেরা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে?

২-৩. এ ধরনের লোকেরা এতিমের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে, অভাবগ্রস্তকে অনুদানে কোনো আগ্রহ বোধ করে না বা অন্যকেও উৎসাহিত করে না।

৪-৭. আর দুর্ভোগ সেই নামাজীদের জন্যে, যারা সচেতনভাবেই নামাজে অমনোযোগী, শুধু লোক-দেখানোর জন্যে নামাজে शामिल হয়। (দুর্ভোগ তাদের জন্যেও) যারা নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোটখাটো সাহায্য দানেও বিরত থাকে।

১০৮. সূরা কাওসার

রুকু ১ ॥ আয়াত ৩ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হে নবী!) আমি অবশ্যই তোমাকে কাওসার (অনন্ত কল্যাণ) দান করেছি। ২-৩. অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্যেই নামাজ পড়ো ও কোরবানি দাও। নিশ্চয়ই তোমার প্রতি যে-ই বিদ্বেষ পোষণ করবে, বিলুপ্ত হবে ওর বংশধারা।

১০৯. সূরা কাফিরুন

রুকু ১ ॥ আয়াত ৬ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হে নবী! ওদের) বলো, হে সত্য অস্বীকারকারীরা! ২. আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা করো। ৩. আর তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। ৪. তোমরা যার ইবাদত করছ আমি তার ইবাদত করতে প্রস্তুত নই। ৫. আর তোমরাও তাঁর ইবাদত করতে প্রস্তুত নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। ৬. অতএব তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে আর আমার ধর্ম আমার জন্যে।

১১০. সূরা নসর

রুকু ১ ॥ আয়াত ৩ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে ২-৩. আর (হে নবী!) তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর ধর্মবিধানে অর্থাৎ আল্লাহতে পুরোপুরি সমর্পিত হতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের অসীম মহিমা ঘোষণা করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো ও তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।

১১১. সূরা লাহাব

রুকু ১ ॥ আয়াত ৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

ধ্বংস হবে আবু লাহাবের দুই হাত । ধ্বংস হবে সে নিজেও ।

২. তার ধনসম্পত্তি ও উপার্জন কোন কাজে আসবে?

৩-৫. সময় হলেই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে ।

সাথে থাকবে কুচত্রী স্ত্রী । গলায় থাকবে শক্ত পাকানো রশি ।

১১২. সূরা ইখলাস

রুকু ১ ॥ আয়াত ৪ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হে নবী! ওদের) বলো, তিনিই আল্লাহ—একক, অদ্বিতীয়।

২. আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন।

৩. না কেউ তাঁর সন্তান, না তিনি কারো সন্তান।

৪. তাঁর তুলনা শুধু তিনিই।

১১৩. সূরা ফালাক

রুকু ১ ॥ আয়াত ৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হে নবী! তুমি) বলো, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের
সৃষ্টার। আশ্রয় গ্রহণ করছি তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে, রাতের
অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে, গ্রহীতে ফুৎকারদানকারী ডাইনিদের
অনিষ্ট থেকে, হিংসূকের হিংসার অনিষ্ট থেকে।

১১৪. সূরা নাস

রুকু ১ ॥ আয়াত ৬ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হে নবী! তুমি) বলো, মানুষের অন্তরে গোপনে
কুমন্ত্রণাদানকারীর কুমন্ত্রণা এবং জ্বীন ও মানুষের কুমন্ত্রণার
অনিষ্ট থেকে মানুষের অধিপতি, মানুষের উপাস্য, মানুষের
প্রতিপালকের নিকট আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি।

সপ্ত সূরা

৩১. সূরা লোকমান

রুকু ৪ ॥ আয়াত ৩৪ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আলিফ-লাম-মীম । ২-৫. প্রজ্ঞাময় কিতাবের এ ঐশীবিধান সৎকর্মশীলদের জন্যে (করণাময়ের) রহমত ও পথনির্দেশনা । সৎকর্মশীলরা নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে । তারা অন্তরের গভীর থেকে পরকালে জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে । তারা তাদের প্রতিপালকের হেদায়েতের পথে আছে আর সেজন্যে তারাই অনন্ত কল্যাণলাভে ধন্য হবে ।

৬-৭. আর একশ্রেণির মানুষ (ঐশীবাণীর পরিবর্তে) অসার কথাবার্তাকেই প্রাধান্য দেয় । ওরা এই অর্থহীন বাক্যমালা ব্যবহার করে নির্বোধ লোকদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে এবং আল্লাহর বিধান নিয়ে হাসিতামাশা করে । ওদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক কঠিন শাস্তি । এ ধরনের কাউকে যখনই আমার আয়াত শোনানো হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে কিছুই শোনে নি, যেন সে একেবারে বধির । ওদের কঠিন শাস্তির সংবাদ দাও ।

৮-৯. আর যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাদের জন্যে রয়েছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত । আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

অনুসারে সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১০-১১. তিনিই নভোমণ্ডলকে নির্মাণ করেছেন কোনো খুঁটি ছাড়া, যা তোমরা নিজ চোখেই দেখছ। তিনি পৃথিবীতে পর্বতমালা বসিয়েছেন জমিনের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে। তিনি জমিনে সব ধরনের প্রাণিকুলের বিস্তারের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি মেঘমালা হতে বৃষ্টিবর্ষণ করে সব ধরনের সুকোমল প্রাণের বিকাশকে নিশ্চিত করেছেন। এ সবই আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি ছাড়া অন্য কেউ কোনোকিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও। আসলে জালেমরা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

॥ রুকু ২ ॥

১২. আমি লোকমানকে এ প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান দান করেছিলাম, ‘আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তার নিজেরই কল্যাণ করে। আর কেউ অকৃতজ্ঞ হলে (তার জানা উচিত) আল্লাহ তো অভাবমুক্ত ও সদাপ্রশংসিত।’

১৩. স্মরণ করো, লোকমান তার পুত্রকে বলেছিল, ‘হে আমার সন্তান! আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক কোরো না। নিশ্চয়ই শিরক অতিবড় জুলুম (মহাপাপ)।’

১৪. এবং (আল্লাহ বলেন) ‘আমি তো সবাইকে তার মা-বাবার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা কষ্টের পর কষ্টস্বীকার করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে। আর তাকে বুকের দুধ ছাড়াতে লাগে পুরো দুই বছর। অতএব আমার প্রতি ও তোমার মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। কারণ আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে।’

১৫. ‘(মা-বাবাকে সম্মান করো) কিন্তু যেহেতু তুমি জানো আল্লাহর কোনো শরিক নেই, তাই তোমার মা-বাবা যদি আমার সাথে কাউকে শরিক করার ব্যাপারে চাপ দেয় (আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কোনো কাজ করতে বলে) তাহলে কখনো তাদের সে-কথা মানবে না। তবে এরপরও তাদের সাথে সবসময় সুন্দর ব্যবহার করবে, তাদের খেদমত করবে। যারা বিশ্বুদ্ধচিত্তে আমার পথে চলে শুধু তাদেরকেই অনুসরণ করবে। তোমাদের সবাইকে শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন জীবনে যা-কিছু করেছ, সবকিছুই বুঝিয়ে দেয়া হবে।’

১৬. (লোকমান বলল) হে আমার সন্তান! সরিষার দানা পরিমাণ কোনোকিছুও যদি পাথরের ভেতরে, জমিনের নিচে বা নভোমণ্ডলের কোথাও (লুকিয়ে রাখা) থাকে, তবে আল্লাহ তা-ও হাজির করবেন। আল্লাহ তো সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।

১৭. হে আমার সন্তান! নামাজ কায়েম করো। অন্যকে সৎকর্মে অনুপ্রাণিত করো ও অসৎকর্মে নিরুৎসাহিত করো। আর বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যধারণ করো। এটাই প্রত্যয়ী মানুষের কাজ। ১৮. কখনো অহংকারবশত মানুষকে অবজ্ঞা করো না, মাটিতে গর্বিতভাবে পা ফেলো না। উদ্ধত অহংকারীকে নিশ্চয়ই আল্লাহ অপছন্দ করেন।

১৯. (হে আমার সন্তান!) চালচলনে সুশীল হও। মোলায়েম কণ্ঠে কথা বলো। (কখনো কণ্ঠস্বরকে গাধার স্বরের মতো ককর্ষণ করো না) নিশ্চয়ই গাধার কণ্ঠস্বর সবচেয়ে ককর্ষণ।

॥ রুকু ৩ ॥

২০. তোমরা কি দেখ না, মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তা ভরপুর করেছেন দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য নেয়ামতে? তারপরও কিছু মানুষ আল্লাহকে নিয়ে তর্ক করে—এদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশক, না আছে দীপ্যমান কোনো গ্রন্থ।

২১. যখন ওদের বলা হয়, ‘আল্লাহ-প্রেরিত বাণী অনুসরণ করো’, তখন ওরা বলে, ‘না না, আমরা আমাদের বাপদাদাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব।’ শয়তান ওদের জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে ডাকলেও কি ওরা তা-ই অনুসরণ করবে?

২২. যে-কেউ আল্লাহতে সমর্পিত হয় এবং সৎকর্ম করে, সে আসলে একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় শক্তভাবে ধরে। সব ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা তো আল্লাহরই হাতে।

২৩-২৪. এরপর কেউ সত্য অস্বীকার করলে তা যেন তোমাকে চিন্তিত না করে। ওদের তো আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তারপর ওরা জীবনে যা করেছে, সবই ওদের অবহিত করা হবে। মানুষের অন্তরে যা রয়েছে, আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। আমি দুনিয়ায় ওদের ভোগবিলাসের সুযোগ দিয়েছি স্বল্পকালের জন্যে। এরপর কঠিন আজাব ভোগ করতে বাধ্য করব ওদের।

২৫. (অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে) তুমি যদি ওদের জিজ্ঞেস করো, মহাকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয়ই ওরা বলবে, ‘আল্লাহ!’ ওদের বলো, (তা হলে তোমাদের জানা উচিত) ‘সকল প্রশংসা শুধু আল্লাহর।’ কিন্তু ওদের অধিকাংশই একথার মর্ম বোঝে না।

২৬-২৭. মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর। আল্লাহ তো অভাবমুক্ত ও সদাপ্রশংসিত। পৃথিবীর সমস্ত গাছ যদি কলম হয় আর সকল সমুদ্রের পানি যদি কালি হয়, তবুও আল্লাহর মহিমা লিখে শেষ করা যাবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৮. (আসলে আল্লাহর জন্যে) তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটিমাত্র প্রাণের সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মতোই (অতিসামান্য কাজ)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনে, সব দেখেন।

২৯. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ রাতকে বড় করে দিনকে ছোট করেন আবার রাতকে ছোট করে দিনকে বড় করেন! তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মের অধীন করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট কক্ষপথে বিচরণ করে। তোমরা যা-কিছু করো, আল্লাহ তা সবই জানেন। ৩০. প্রকৃতির সবকিছুই প্রমাণ করে যে, আল্লাহই ধ্রুবসত্য। আর ওরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাকেই (উপাস্য হিসেবে) ডাকে, তা ডাহা মিথ্যা। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ সুমহান।

॥ রুকু ৪ ॥

৩১-৩২. তুমি কি লক্ষ করো না যে, আল্লাহর অনুগ্রহেই নৌযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে। এ-তো তাঁর মহিমার নিদর্শন। অবশ্যই এতে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ মানুষের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। যখন উত্তাল তরঙ্গে নৌযান দুলতে থাকে, তখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ওরা হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহকে ডাকে, আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু যখন তিনি ওদের উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসেন, তখন ওদের

অনেকেই (বিশ্বাস আর শিরকের) মাঝপথে আটকে যায়। আসলে কেবল মিথ্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে।

৩৩. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে সচেতন হও এবং ভয় করো সেদিনের, যেদিন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না, না সন্তান পিতার কোনো উপকার করতে পারবে। অবশ্যই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (পুনরুত্থান) অনিবার্য সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবনের মোহ যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চনামূলক চিন্তাভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়ে শয়তানের ধোঁকায় যেন পড়ে না যাও।

৩৪. নিশ্চয়ই কখন কেয়ামত হবে তা শুধু আল্লাহই জানেন। তিনি মেঘ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন। তিনি জানেন জরায়ুতে কী আছে। অথচ কেউই জানে না আগামীকাল তার জন্যে কী অপেক্ষা করছে এবং কেউ জানে না কোথায় তার মৃত্যু হবে। শুধু আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ে অবহিত।

৩৬. সূরা ইয়া-সীন

রুকু ৫ ॥ আয়াত ৮৩ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

ইয়া-সীন। ২. সাক্ষী এই প্রজ্ঞাময় কোরআন। ৩. তুমি অবশ্যই রসুলদের একজন। ৪. তুমি নির্ভুল সত্যপথের অনুসারী। ৫. মহাপরাক্রমশালী পরমদয়ালু আল্লাহর কাছ থেকে এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। ৬. যাতে তুমি এমন এক জাতিকে সতর্ক করতে পারো, যাদের বাপদাদাদের ইতঃপূর্বে সতর্ক করা হয় নি। ফলে তারা সত্য-মিথ্যার ব্যাপারে অসচেতন।

৭. (তবে সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করায়) ওরা বিশ্বাস স্থাপন করবে না, ওদের অধিকাংশের জন্যেই শাস্তি অবধারিত। ৮. আমি ওদের গলায় চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে ওরা উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। ৯. আমি ওদের সামনে ও পেছনে দেয়াল তুলে দিয়েছি এবং ওদের দৃষ্টিকে পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি, ফলে ওরা সত্যকে দেখতে ও বুঝতে পারে না। ১০. তুমি ওদের সতর্ক করো আর না করো, ওদের কাছে দুটোই সমান। ওরা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

১১. (হে নবী!) তুমি শুধু তাদেরই সতর্ক করতে পারবে, যাদের হৃদয় সত্য শুনতে প্রস্তুত এবং না দেখেও যারা করুণাময় আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন। তাদের তুমি ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দাও। ১২. আমি অবশ্যই একদিন মৃতকে জীবিত করব। আর তাদের সব কর্মকাণ্ডের পূর্ণ বিবরণ রেকর্ড করা হচ্ছে এবং তাদের সব ভালো-মন্দের নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে (বিশেষ প্রক্রিয়ায়)।

॥ রুকু ২ ॥

১৩-১৪. হে নবী! দৃষ্টান্ত হিসেবে ওদের কাছে বর্ণনা করো সেই জনপদের কথা, যেখানে রসুল এসেছিল। আমি ওদের কাছে দুজন রসুল পাঠিয়েছিলাম। ওরা দুজনকেই মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করল। তখন এদের সাহায্যের জন্যে তৃতীয়জনকে পাঠালাম। তখন তারা সবাই বলল, ‘আমরা তোমাদের কাছে রসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।’

১৫. ওরা বলল, তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ। দয়াময় আল্লাহ কিছুই প্রেরণ করেন নি। তোমরা শুধু শুধু মিথ্যা বলছ। ১৬. তারা জবাবে বলল, আমাদের প্রতিপালক জানেন, আমরা নিঃসন্দেহে তোমাদের কাছে রসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। ১৭. আর সত্যের বাণী সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব।

১৮. জনপদের অধিবাসীরা তখন হুমকি দিল, আমরা তোমাদেরকে অশুভ-অমঙ্গলের কারণ মনে করি। তোমাদের প্রচারণা থেকে তোমরা বিরত না হলে, আমরা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করব ও কঠিন শাস্তি দেবো। ১৯. জবাবে রসুলরা বলল, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই সম্পৃক্ত। তোমাদের বিবেকের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দেয়াটাকেই কি তোমরা অশুভ মনে করছ? হায়! আসলে তোমরা নিজেরাই সীমালঙ্ঘন করছ, নিজেদের অমঙ্গল ডেকে আনছ।

২০-২১. এর মধ্যেই জনপদের একপ্রান্ত থেকে একজন ছুটে এসে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রসুলদের অনুসরণ করো! এরা সত্যপথের অনুসারী আর এরা তো তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চায় নি। তাই এদের নিঃসংকোচে অনুসরণ করো।’

২২. সে বলল, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যাঁর কাছে আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে, তাঁর ইবাদত না করার পেছনে আমার কী যুক্তি থাকতে পারে! ২৩. আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করব? অথচ দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে এই উপাস্যদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না। আর এরা আমাকে বিপদ থেকেও উদ্ধার করতে পারবে না।

২৪. তাই (আল্লাহ ছাড়া) অন্য কোনো উপাস্য গ্রহণ করলে আমি নিশ্চিতই বিভ্রান্তির অন্ধকারে হারিয়ে যাব।

২৫. এরপর সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের সবার প্রতিপালকের ওপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তোমরা আমার কথা শোনো! তোমরাও বিশ্বাস স্থাপন করো!

২৬-২৭. (কিন্তু ওরা তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ফেলল) এরপর তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো। তখন সে বলে উঠল, ‘হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত, কী কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!’

২৮-২৯. তার মৃত্যুর পর আমি তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোনো সেনাবাহিনী পাঠাই নি, আর তার প্রয়োজনও ছিল না। শান্তির জন্যে শুধু এক প্রচণ্ড শব্দ। আর সেই জনপদের সবকিছু ছাইয়ের মতো নিস্তব্ধ নিস্ত্রাণ হয়ে গেল।

৩০. হায়! (অধিকাংশ) মানুষকে আফসোসের বোঝা বহন করতে হবে। ওদের নিকট যখনই কোনো রসূল এসেছে, তখনই ওরা তাকে নিয়ে হাসিতামাশা করেছে।

৩১-৩২. ওরা কি লক্ষ করে না, ওদের আগে কত জনগোষ্ঠীকেই না (পাপাচারের জন্যে) আমি নিশ্চিহ্ন করেছি,

যারা আর কখনোই ওদের কাছে ফিরে যাবে না? কিন্তু ওরা সকলেই একদিন আমার কাছে ফিরে আসবে।

॥ রুকু ৩ ॥

৩৩-৩৫. ওদের জন্যে আমার সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের ক্ষমতার একটি নিদর্শন হচ্ছে ধূসর জমিন। আমি ধূসর জমিনকে সঞ্জীবিত করি, উৎপন্ন করি ফসল, যা ওরা আহার করে। সৃজন করি খেজুর ও আঙুরের বাগান, বহমান করি বার্নাধারা, যাতে ওরা সেখান থেকে ফলমূল খেতে পারে। অথচ এগুলো কিছুই ওদের হাতে বানানো নয়। এরপরও কি ওরা শুকরিয়া প্রকাশ করবে না?

৩৬. তিনি মহাপবিত্র, মহামহিম। তিনি জমিনের সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় (বিপরীত ও পরিপূরক করে) সৃষ্টি করেছেন। মানুষের নিজস্ব সত্তার মধ্যে এবং যে-সম্পর্কে এখনো ওদের কোনো জ্ঞান নেই, তার মধ্যেও রয়েছে এই বৈপরীত্য ও পরিপূরকতা।

৩৭. ওদের জন্যে (সৃষ্টির সবকিছুর ওপর আমার ক্ষমতার) আরেক নিদর্শন হচ্ছে রাত। যখন আমি দিনের আলো সরিয়ে নিই, তখন সব অন্ধকারে ছেয়ে যায়।

৩৮-৪০. আর সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করছে। আর এ পথ মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক

সুনির্দিষ্ট। চাঁদের জন্যেও নির্দিষ্ট রয়েছে কক্ষপথ। আর বিভিন্ন কলা বা দশা অতিক্রম করে তা শুকনো বাঁকানো খেজুর শাখার রূপ লাভ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া আর না রাত কখনো হজম করতে পারবে দিনকে। মহাবিশ্বে সবকিছুই চলছে আমার নির্ধারিত নিয়মে।

৪১-৪৩. ওদের জন্যে (আমার মহিমার) আরেক নিদর্শন হচ্ছে, ওদের বংশধরদের আমি নৌকা বোঝাই করে সাগরে নিয়ে গেছি। আর ওদের আরোহণের জন্যে আরো নৌযান নির্মাণের ব্যবস্থা করেছি। আমি ইচ্ছা করলে ওদের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারতাম, ওদের আর্তচিৎকারে কেউই এগিয়ে আসত না, কেউই ওদের উদ্ধার করতে পারত না।
৪৪. শুধু আমার দয়াই ওদের তীরে পৌঁছায় এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দেয়।

৪৫-৪৬. যখন ওদের বলা হয়, তোমাদের সামনে প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয়ে (স্রষ্টা যা বলেছেন সে-সম্পর্কে) সচেতন হও, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো (তখন ওরা তা না শোনার ভান করে)। আসলে ওদের প্রতিপালকের কোনো বাণী যখনই ওদের কাছে পৌঁছায় (তখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়)। ৪৭. যখন ওদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করো’, তখন সত্য অস্বীকারকারীরা বিশ্বাসীদের বলে যে,

‘আল্লাহ ইচ্ছা করলেই যাকে খাওয়াতে পারতেন, আমরা কেন তাকে খাওয়াব? তোমরা তো বিভ্রান্তিতে ডুবে আছ।’

৪৮-৫০. ওরা (সত্য অস্বীকারকারীরা) আরো বলে, ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, কেয়ামত কবে হবে?’ আসলে ওরা জানে না যে, পুনরুত্থান নিয়ে বিতর্করত অবস্থাতেই একটিমাত্র বিকট শব্দ হবে, এরপরই ওদের সব শেষ। ওরা না অসিয়ত করতে সক্ষম হবে, না পারবে পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে।

॥ রুকু ৪ ॥

৫১-৫২. যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন মানুষ দলে দলে কবর থেকে উঠে প্রতিপালকের দিকে ছুটতে থাকবে। ভীতশঙ্কিতভাবে ওরা বলবে, ‘হায়রে! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদের মরণঘুম থেকে উঠাল (পুনরুত্থিত করল)?’ তখন ওদের বলা হবে, দয়াময় আল্লাহ তো এই দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর রসুলরা সত্য কথাই বলেছিল।

৫৩. একটিমাত্র প্রচণ্ড শব্দ! আর তখনই ওদের সবাইকে আমার সামনে হাজির করা হবে। ৫৪. আর ঘোষণা করা হবে, ‘আজ কারো ওপর কোনো অন্যায করা হবে না, তোমরা দুনিয়ায় যা করেছ শুধু তার প্রতিফল দেয়া হবে।’

৫৫-৫৮. এদিন যাদের ঠিকানা হবে জান্নাত, তারা আনন্দে মগ্ন থাকবে, তারা ও তাদের সুযোগ্য সমুজ্জ্বল সাথিরা সুশীতল ছায়ায় অনন্ত শান্তিতে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তাদের জন্যে থাকবে সুস্বাদু খাবার, ফলমূল ও কাজিফত সবকিছু। দয়াময় প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের জানানো হবে সালাম ও সম্ভাষণ।

৫৯. সেদিন আরো বলা হবে, হে পাপিষ্ঠরা! তোমরা আজ আলাদা হয়ে যাও।

৬০. হে আদমসন্তান! আমি কি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিই নি যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা করবে না? কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। ৬১. আর তোমরা শুধু আমারই ইবাদত করবে। এটাই সাফল্যের সরলপথ।

৬২. (সেদিন সত্য অস্বীকারকারীদের বলা হবে) শয়তান তোমাদের আগেও অনেককে বিভ্রান্ত করেছিল, তারপরও কেন তোমরা তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করো নি? ৬৩. এই সেই জাহান্নাম, যে-সম্পর্কে তোমাদের বার বার সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। ৬৪. যাও! এবার জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকো, কারণ তোমরা ক্রমাগত সত্যকে অস্বীকার করেছিলে।

৬৫. সেদিন আমি ওদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবো। ওদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, পা সাক্ষ্য দেবে ওদের সকল

কৃতকর্মের। ৬৬-৬৭. যদি আমি ইচ্ছা করতাম যে, মানুষ (ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে না পেরে) মন্দে ডুবে যাক, তাহলে তাকে আমি দৃষ্টিহীন অর্থাৎ সহজাত বিচারবুদ্ধি থেকে বঞ্চিত করতে পারতাম। আর তা করলে তারা সত্যপথ সম্পর্কে জানত কীভাবে? আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম (যে, ভালো বা মন্দ গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের কোনো স্বাধীনতা থাকবে না) তাহলে তাদের ভিন্ন প্রকৃতিতে সৃষ্টি করতাম। (তাদের প্রবৃত্তিকে এমন ছকে গেঁথে দিতাম যে) তারা না ভালোর পথে অগ্রসর হতে পারত, না মন্দ থেকে সরে আসতে পারত।

॥ রুকু ৫ ॥

৬৮. (ওদের সবসময় মনে রাখা উচিত) যদি আমি কাউকে দীর্ঘজীবন দেই, তখন (বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার শক্তি ও ক্ষমতা) ক্রমান্বয়ে কমানোর ব্যবস্থা করি। এরপরও কি ওরা ওদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না?

৬৯. আমি রসুলকে কাব্য শেখাই নি। তাছাড়া কাব্য এ উপদেশবাণী প্রকাশে মানানসইও নয়। এটি সহজে বোধগম্য কোরআন এবং সুস্পষ্টভাবেই সত্যের দিক-নির্দেশক।

৭০. জীবিত প্রত্যেককে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে এই বাণী নাজিল হয়েছে আর এ বাণীই অকাট্য দলিল হবে সত্য অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে।

৭১. ওরা কি লক্ষ করে না, আমার সৃষ্টির মধ্যে ওদের জন্যে রয়েছে গবাদি পশু, ওরাই এখন এগুলোর মালিক!
 ৭২. আমি এগুলোকে ওদের বশীভূত করে দিয়েছি। এ গবাদি পশুর কিছু ওদের বাহন আর কিছু ওদের খাবার।
 ৭৩. গবাদি পশু থেকে ওরা পাচ্ছে নানাধরনের উপকার ও উত্তম পানীয়। এরপরও কি ওদের শোকরগোজার হওয়া উচিত নয়?

৭৪-৭৫. এরপরও ওরা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে এই আশায় যে, ওরা সাহায্য পাবে। (কিন্তু ওরা জানে না যে) এইসব কল্পিত উপাস্য ওদের কোনো সাহায্য করতে পারবে না। এমনকি এই উপাস্যদের সবাইকে কাতারে কাতারে উপস্থিত করা হলেও নয়। ৭৬. অতএব সত্যবিমুখদের কোনো কথায় তোমার দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। ওদের প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই আমি জানি।

৭৭. অতএব মানুষ কি সচেতন হবে না যে, আমি মাত্র একবিন্দু শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছি? এরপর এখন সে মনে করে (স্রষ্টা সম্পর্কে) বিতর্ক, বাগ্বিতণ্ডা করার শক্তি তার রয়েছে। ৭৮. (দ্রুণ থেকে) ভূমিষ্ঠ হওয়ার বিষয়টি ভুলে গিয়ে মানুষ আমার ক্ষমতা সম্পর্কে অদ্ভুত সব কথা বলে! সে বলে, পচাগলা মিশে যাওয়া হাড়ে কে প্রাণসঞ্চারণ করবে?

৭৯. হে নবী! বলো, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনিই আবার তাকে প্রাণ দেবেন। কারণ তিনি সৃষ্টির সকল রহস্য ভালোভাবেই জানেন। ৮০. তিনিই সবুজ গাছ থেকে তোমাদের জন্যে আগুন উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে করে তোমরা আগুন জ্বালাতে পারো।

৮১. যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি মৃতদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করতে পারবেন না? হাঁ! অবশ্যই পারবেন। তিনি মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। ৮২. আসলে তিনি যখন কোনোকিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি শুধু বলেন ‘হও’, তখনই তা হয়ে যায়। ৮৩. তিনি পবিত্র, মহান। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

৪৮. সূরা ফাতাহ

রুকু ৪ ॥ আয়াত ২৯ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে নবী! আমি তোমার জন্যে সুস্পষ্ট বিজয় অবধারিত করেছি। ২-৩. যাতে করে আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিগুলো মাফ করেন, তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করেন এবং তোমাকে সাফল্যের সরলপথে পরিচালিত করেন। আর তোমাকে সর্বাঙ্গিক সাহায্য দান করেন।

৪. তিনিই বিশ্বাসীদের অন্তর প্রশান্ত করে দিলেন, যাতে তারা এই সত্যকে অনুধাবন করতে পারে যে, মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল শক্তি আল্লাহর কুদরতের অধীন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর এ সত্যের অনুধাবন তাদের বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করবে।

৫. তিনি বিশ্বাসী নরনারীকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান বর্ণাধারা, আর সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর তিনি তাদের সব গুনাহ মাফ করবেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই মহাসাফল্য।

৬. আর মুনাফেক ও শরিককারী নরনারী, যারা আল্লাহ

সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা পোষণ করে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন। একের পর এক অমঙ্গল আপতিত হবে ওদের ওপর। আল্লাহ ওদের ওপর রুষ্ট হয়েছেন এবং ওদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। ওদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট নিবাস!

৭. মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল শক্তি আল্লাহর কুদরতের অধীন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৮. আমি রসুলকে সত্যের সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে (তোমাদের কাছে) পাঠিয়েছি। ৯. যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করো, রসুলকে সহযোগিতা ও সম্মান করো। আর সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো।

১০. হে নবী! যারা তোমার কাছে বায়াত অর্থাৎ আনুগত্যের শপথ নিচ্ছিল, তারা আল্লাহর কাছেই আনুগত্যের শপথ নিচ্ছিল। (তারা যখন তোমার হাতের ওপর হাত রেখেছিল তখন) তাদের হাতের ওপর ছিল আল্লাহর হাত। অতএব যে এ শপথ ভাঙবে সে এর পরিণাম ভোগ করবে। আর যে শপথ রক্ষা করবে আল্লাহ তাকে মহাপুরস্কারে সম্মানিত করবেন।

॥ রুকু ২ ॥

১১. হে নবী! যে-সব বেদুইন জেহাদে যোগ না দিয়ে পেছনে রয়ে গেছে, তারা অবশ্যই এখন তোমাকে বলবে, ‘আমরা আমাদের ধনসম্পত্তি ও পরিবার-পরিজন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। তাই আপনি আমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।’ আসলে ওরা মুখে যা বলে অন্তরের কথা তা থেকে আলাদা। ওদের বলো, ‘আল্লাহ তোমাদের কারো ক্ষতি বা কল্যাণ করতে চাইলে কে তাঁকে বাধা দিতে পারে? তোমরা যা করো সে-বিষয়ে আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন।’

১২. আসলে তোমরা মনে করেছিলে যে, রসুল ও বিশ্বাসীগণ কখনোই তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। এটা ভেবে তোমরা ভেতরে ভেতরে উল্লসিত হচ্ছিলে। তোমরা দুষ্টচিন্তায় নিমজ্জিত ছিলে, তোমাদের মানসিকতা খুবই জঘন্য।

১৩. আল্লাহ ও তাঁর রসুলে যারা বিশ্বাস করে না, সেই সব সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত রয়েছে। ১৪. মহাকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তবে তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

১৫. হে বিশ্বাসীগণ! যখনই তোমরা এমন কোনো যুদ্ধযাত্রা করবে, যেখানে বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পত্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে পেছনে রেখে যাওয়া লোকজন বলবে, ‘আমাদেরও তোমাদের সাথে যেতে দাও।’ ওরা আল্লাহর নির্দেশ বদলে দিতে চায়। ওদের স্পষ্ট করে বলো, ‘তোমরা আমাদের সাথে আসবে না। (যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পত্তি কারা পাবে) আল্লাহ আগেই তা নির্ধারিত করে রেখেছেন।’ ওরা বলবে, ‘তোমরা তো আসলে আমাদের সাথে হিংসা করছ।’ আসলে ওরা সত্য খুব কমই বোঝে।

১৬. যে-সব বেদুইন ঘরে থেকে গিয়েছিল, তাদের বলো, তোমাদের খুব শিগগিরই ডাকা হবে প্রবল পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে। ওরা আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমরা জেহাদের এ নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদের উত্তম পুরস্কার দেবেন। কিন্তু তোমরা যদি আগের মতো পালিয়ে যাও, তবে তিনি তোমাদের কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দেবেন।

১৭. অন্ধ, পঙ্গু বা রুগ্ণ ব্যক্তি যদি জেহাদে না আসে তবে তাতে কোনো দোষ নেই। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্ণাধারা। আর যে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

॥ রুকু ৩ ॥

১৮. আল্লাহ বিশ্বাসীদের ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা (হে মুহাম্মদ!) তোমার কাছে গাছের নিচে বায়াত অর্থাৎ আনুগত্যের শপথ করছিল। তাদের অন্তরের অবস্থা তিনি জানতেন। তাই তিনি তাদের অন্তরে নাজিল করলেন প্রশান্তি আর পুরস্কার হিসেবে দিলেন আসন্ন বিজয়।

১৯. যুদ্ধে তারা লাভ করবে বিপুল সম্পদ। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২০. (হে বিশ্বাসীগণ!) আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তোমরা যুদ্ধে বিজয় ও বিপুল সম্পদের অধিকারী হবে। তিনি তোমাদের বিজয় ত্বরান্বিত করবেন। তিনি শত্রুর হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন, যাতে অনাগত বিশ্বাসীদের জন্যে এটি হয় এক উজ্জ্বল নিদর্শন। আল্লাহ সবসময়ই তোমাদের সাফল্যের সরলপথে পরিচালিত করেন।

২১. আরো অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসে নি, আল্লাহ তা তোমাদের জন্যে রেখেছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২২. সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে ওরা অবশ্যই পালিয়ে যেত। তখন ওদেরকে রক্ষা করার বা সাহায্য করার জন্যে কাউকেই পেত না।

২৩. অতীতে এই ছিল আল্লাহর বিধান এবং ভবিষ্যতেও আল্লাহর বিধানে তুমি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

[আল্লাহর বিধান খুব সুস্পষ্ট : এক. ‘সত্যিকার বিশ্বাসী হলে তোমাদের উত্থান সুনিশ্চিত।’ (আলে ইমরান : ১৩৯)

দুই. ‘ভেতর থেকে না বদলালে অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে আল্লাহ কোনো জাতি বা মানুষের অবস্থা বদলান না।’ (রাদ : ১১) এটাই হচ্ছে পরিবর্তনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক শর্ত।]

২৪. আমি মক্কা অঞ্চলে তোমাদের বিজয় দান করার পর ওদের হাতকে তোমাদের বিরুদ্ধে এবং তোমাদের হাতকে ওদের বিরুদ্ধে নিরস্ত করেছি। তোমরা যা-কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন।

২৫. ওরা তো সত্য অস্বীকারকারী। ওরা তোমাদের কাবাঘরে যেতে বাধা দিয়েছে, কোরবানির পশুগুলোকেও যথাস্থানে পৌঁছতে দেয় নি। ওদের মধ্যেও তোমরা চেনো না এমন বিশ্বাসী নারী-পুরুষ রয়েছে, তাই মক্কায় প্রবেশের জন্যে তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয় নি। কারণ তখন যুদ্ধের আদেশ দেয়া হলে, মক্কায় প্রবেশকালে তোমাদের অজ্ঞাতসারেই যদি এই বিশ্বাসীরা নিহত হতো, তোমরা কলঙ্কিত হতো। তাই যুদ্ধকে নিবৃত্ত করা হয়েছে, যাতে

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে রহমতের ছায়ায় শামিল করতে পারেন। এই বিশ্বাসীরা আলাদা থাকলে আমি সত্য অস্বীকারকারীদের কঠিন শাস্তি দিতাম।

২৬. সত্য অস্বীকারকারীরা যখন ক্রমাগত অন্তরে জাহেলিয়াত বা অবিদ্যাপ্রসূত অহমিকা ও ঔদ্ধত্য পোষণ করছিল, তখন আল্লাহ তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদের অন্তর পাবিত করলেন অনাবিল প্রশান্তিতে। তাদের বিশ্বাস ও আল্লাহ-সচেতনতাকে করলেন আরো দৃঢ়। আসলে তারাই এ রহমত পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ সবকিছু জানেন।

॥ রুকু ৪ ॥

২৭. আল্লাহ তাঁর রসুলকে সত্য-স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই কাবাঘরে নিরাপদে প্রবেশ করবে—কেউ কেউ মুণ্ডিতমস্তকে, কেউ কেউ চুল ছেঁটে। তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না। তোমরা যা জানো না, আল্লাহ তা জানেন। এ-ছাড়াও তিনি তোমাদের জন্যে নিশ্চিত করেছেন আসন্ন বিজয়।

২৮. আল্লাহ তাঁর রসুলকে হেদায়েত ও সত্যধর্ম প্রচারের জন্যে পাঠিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মের নামে প্রচলিত সকল মিথ্যার ওপর এই সত্যধর্মকে বিজয়ী করবেন। এ সত্যের সাক্ষী আল্লাহর মতো আর কেউই হতে পারে না।

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল। তার সঙ্গীরা সত্য অস্বীকারকারীদের মোকাবেলায় দৃঢ় ও অনমনীয় আর নিজেরা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। আল্লাহর রহমত ও সম্ভ্রষ্ট কামনায় তোমরা তাদের রুকু ও সেজদায় নিমগ্ন অবস্থায় দেখবে। তাদের চেহারা ও আচরণে এ সেজদা অর্থাৎ সমর্পিত জীবনেরই প্রতিফলন ঘটবে। তাওরাত ও ইঞ্জিলে তাদের উপমা হচ্ছে, তারা এমন বীজের মতো, যা অঙ্কুরিত হয়ে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। একসময় কাণ্ডের ওপর শক্ত হয়ে আকাশে মাথা উঁচু করে আর চাষীকে দেয় অপার আনন্দ। আল্লাহও একইভাবে বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধ করবেন, আর তাতে সত্য অস্বীকারকারীদের অন্তর্জ্বালা বাড়তে থাকবে। (বিদ্রাস্তদের মধ্য থেকেও) যারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করবে, আল্লাহ তাদেরকেও ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।

৪৯. সূরা হুজুরাত

রুকু ২ ॥ আয়াত ১৮ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সামনে কোনো বিষয়ে (নিজেদের খেয়ালবশত) অগ্রণী হয়ে কথা বোলো না। সবসময় আল্লাহ-সচেতন থাকো। অবশ্যই আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

২-৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের চেয়ে তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না। নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চকণ্ঠে কথা বলো, রসুলের সাথে সেভাবে উচ্চকণ্ঠে কথা বোলো না (তোমাদের ব্যক্তিগত মতামতকে রসুলের মতামতের ওপর প্রাধান্য দিও না)। কারণ এতে তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। যারা রসুলের সামনে বিনম্রভাবে কথা বলে, তাদের অন্তর আল্লাহ-সচেতনতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৪-৫. হে নবী! যারা তোমার ঘরের বাইরে থেকে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করে, এদের অধিকাংশই নির্বোধ। তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগপর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধরে

অপেক্ষা করত, তবে তা তাদের জন্যেই ভালো হতো।
আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৬. হে বিশ্বাসীগণ! কোনো ফাসেক (দুরাচারী) তোমাদেরকে
কোনো খবর বা তথ্য দিলে অবশ্যই তার সত্য্যাসত্য
যাচাই করবে। তা না হলে (হুজুগে পড়ে) কোনো
জনগোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করে ফেলতে পারে। পরে তোমরাই
অনুতপ্ত হবে।

৭-৮. তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসুল
রয়েছেন। তিনি তোমাদের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিলে
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমরাই অসুবিধায় পড়তে। কিন্তু আল্লাহ
তোমাদের কাছে বিশ্বাসকে প্রিয় করেছেন আর তোমাদের
হৃদয়ে এর সৌন্দর্যকে গোঁথে দিয়েছেন। সেইসাথে সত্য
অস্বীকার, সত্যত্যাগ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে অপ্রিয়
করেছেন। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ফলে তোমরা সৎপথে
রয়েছ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৯. তাই বিশ্বাসীদের দুটো দল কখনো পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে
লিপ্ত হলে তোমরা বিরোধ মীমাংসা করে দেবে। কিন্তু
তাদের একদল যদি অন্যদলের ওপর বাড়াবাড়ি ও
সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে
তোমরা সংগ্রাম করবে। সীমালঙ্ঘনকারীরা আল্লাহর

নির্দেশিত পথে ফিরে না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম করবে। তারা আল্লাহর পথে ফিরে এলে সুবিচার সহকারে আপস-মীমাংসা করে দেবে। মনে রেখো, আল্লাহ সুবিচারকারীদের পছন্দ করেন।

১০. বিশ্বাসীরা পরস্পরের ভাই। তাই (যদি কখনো তারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়) তাদের মধ্যে শান্তিস্থাপন করো। আর সবসময় আল্লাহ-সচেতন থাকো, যাতে তোমরা অনুগ্রহলাভ করতে পারো।

॥ রুকু ২ ॥

১১. হে বিশ্বাসীগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস বা বিদ্রূপ না করে, কারণ উপহাসকারীর চেয়ে সে ভালো হতে পারে এবং কোনো নারী যেন অপর কোনো নারীকে উপহাস বা বিদ্রূপ না করে, কারণ উপহাসকারিণীর চেয়ে সে ভালো হতে পারে। (সাবধান!) তোমরা একে অপরের বদনাম করো না। মন্দনামে ডেকো না। মন্দনামে ডেকে একে অন্যকে অপমান করো না। বিশ্বাস স্থাপন করার পর মন্দনামে ডাকা অতিগর্হিত কাজ। (এ ধরনের গর্হিত কাজ করার পর) যদি তওবা না করে, তবে তারা নিঃসন্দেহে সীমালঙ্ঘনকারী জালেম।

১২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সাধারণভাবে অন্যের ব্যাপারে আন্দাজ-অনুমান করা থেকে বিরত থাকো। আন্দাজ-অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুনাহের কাজ। অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করো না। কারো অনুপস্থিতিতে গীবত অর্থাৎ পরনিন্দা করো না। তোমরা কি মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চাও? না, তোমরা তো তা ঘৃণা করো (গীবত করা মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমান)। তোমরা সবসময় আল্লাহ-সচেতন থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরমদয়ালু।

১৩. হে মানুষ! তোমাদেরকে আমি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন সমাজ ও জাতিতে ভাগ করেছি, যেন তোমরা পরস্পরের পরিচয় জানতে পারো। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, যে বেশি আল্লাহ-সচেতন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জানেন, সব বিষয়ে সচেতন।

১৪. বেদুইনরা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। (হে নবী!) ওদের বলো, তোমরা আসলে এখনো বিশ্বাস স্থাপন করো নি। বরং তোমাদের বলা উচিত ‘আমরা (বাহ্যিকভাবে) নিজেদের সমর্পণ করেছি।’ কারণ তোমাদের অন্তরে এখনো সত্যিকার বিশ্বাস দানা বাঁধে নি। তবে যদি

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো, তবে তোমাদের কর্মফল অণুপরিমাণও কমানো হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

১৫. সত্যিকার বিশ্বাসী তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর কোনো ধরনের সন্দেহকে প্রশ্রয় দেয় না এবং জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।

১৬. হে নবী! ওদের বলো, তোমরা কি তোমাদের ধর্মপালনের কথা আল্লাহকে জানাতে চাচ্ছ? অথচ আল্লাহ তো মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সবকিছু জানেন।

১৭. ওরা মনে করে, ধর্মে সমর্পিত হয়ে তোমাকে ধন্য করেছে। (হে নবী!) ওদের বলো, ধর্মে সমর্পিত হয়ে তোমরা আমাকে ধন্য করো নি বরং বিশ্বাসের পথে পরিচালিত করে আল্লাহ তোমাদের ধন্য করেছেন, যদি তোমরা বিশ্বাসের ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকো।

১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত। আর তোমরা যা করো আল্লাহ সবই দেখেন।

৫৫. সূরা আর রাহমান

রুকু ৩ ॥ আয়াত ৭৮ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

পরম দয়াময় আল্লাহ। ২. তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।
৩. তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ৪. তিনি তাকে (গুছিয়ে চিন্তা
করতে ও) স্পষ্টভাবে কথা বলতে শিখিয়েছেন। ৫. সূর্য ও
চন্দ্র নির্ধারিত কক্ষপথে ড্রাম্যাণ। ৬. তারকা ও গাছপালা
তাকেই সেজদারত (তঁার নিয়মেই সমর্পিত)।

৭. তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং সবকিছুর জন্যেই
তৈরি করেছেন মানদণ্ড। ৮. তোমরা কখনো ভালো-মন্দ
বিচারে ন্যায়দণ্ড লঙ্ঘন করো না। ৯. সবকিছুর ওজনে
ন্যায্যমান প্রতিষ্ঠা করো এবং ওজন বা বিচারে কারচুপি
করো না।

১০. তিনি জমিনকে সমস্ত সৃষ্টির জন্যে বিছিয়ে দিয়েছেন।
১১. জমিনে রয়েছে সব ধরনের ফলমূল, খেজুর গাছে
নতুন কাঁদি। ১২. নানাধরনের খোসা-আবৃত শস্যদানা
আর সুগন্ধি লতাগুল্ম। ১৩. অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!)
তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে
অস্বীকার করবে?

১৪. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মতো শুকনো মাটি দিয়ে। ১৫. আর (অদৃশ্য) জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াহীন আগুনের শিখা থেকে। ১৬. অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

১৭. তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্ত্রক। ১৮. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

১৯. সমুদ্রের দুই বিশাল স্রোতধারাকে তিনি মুক্তভাবে প্রবাহিত করেন, যাতে তারা পরস্পর মিলিত হতে পারে। ২০. কিন্তু মাঝে রয়েছে অদৃশ্য দেয়াল, ফলে তারা পরস্পরকে অতিক্রম করতে পারে না। ২১. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

২২. আর সমুদ্রে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। ২৩. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

২৪. সমুদ্রে চলমান পর্বতের মতো শোভাময় নৌযানগুলো তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। ২৫. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

॥ রুকু ২ ॥

২৬. মহাবিশ্বে যেখানে যা-কিছু আছে সবই নশ্বর।

২৭. অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহামহিম, মহানুভব। ২৮. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

২৯. মহাবিশ্বের সবকিছুই তাঁর ওপর নির্ভরশীল, তাঁরই নিকট প্রার্থনা করে। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর মহিমা নব নবরূপে দীপ্যমান। ৩০. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৩১. হে (পাপভারাক্রান্ত) জ্বীন ও মানুষ! একদিন আমি তোমাদের সবারই হিসাব নেব।

৩২. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৩৩. হে জ্বীন ও মানুষ! তোমরা যদি পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের সীমানা অতিক্রম করতে চাও, অতিক্রম করো। কিন্তু তোমরা কখনোই আমার অনুমতি ছাড়া তা অতিক্রম করতে পারবে না। ৩৪. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৩৫. (তখন) তোমাদের প্রতি নিষ্কিণ্ত হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তোমরা কখনোই তা প্রতিরোধ করতে পারবে না।

৩৬. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৩৭. আর একদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে (তেল-পোড়া আগুনের মতো) গনগনে লাল হয়ে যাবে। ৩৮. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৩৯. সেদিন কোনো জ্বীন বা মানুষকে তার পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করার প্রয়োজন হবে না। ৪০. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৪১. পাপে নিমজ্জিতদের চেহারা ই বলে দেবে তাদের অবস্থা। তাদের চুলের ঝুঁটি ও পা ধরে টেনেহিঁচড়ে পাকড়াও করে নিয়ে আসা হবে। ৪২. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৪৩. এই সেই জাহান্নাম, যা পাপে নিমজ্জিত ব্যক্তিরা অসত্য মনে করত। ৪৪. জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ওরা দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করতে থাকবে। ৪৫. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

॥ রুকু ৩ ॥

৪৬. কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ-সচেতন ছিল, তার জন্যে জান্নাতে রয়েছে দুটি বাগান। ৪৭. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৪৮. উভয় বাগানই শাখাপ্রশাখায় পরিপূর্ণ সবুজ সতেজ গাছপালায় ভরপুর। ৪৯. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৫০. উভয় বাগানে দুটি স্রোতধারা নিয়ত প্রবহমান। ৫১. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৫২. উভয় বাগানেই প্রতিটি ফলই হবে দুই ধরনের। ৫৩. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৫৪. জান্নাতে তারা বর্ণিল ব্রোকেড করা পুরু রেশমি কার্পেটে ঠেস-বালিশে আরামে হেলান দিয়ে বসবে। দুই বাগানের ফল ঝুলবে তাদের নাগালের মধ্যে। ৫৫. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৫৬. সে বাগানে থাকবে বিস্তৃত দৃষ্টির সমুজ্জ্বল সাথিরা। কোনো জ্বীন বা মানুষ কখনো যাদের কাছে আসে নি। ৫৭. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৫৮. ওরা হবে মুক্তা ও চুনির

উজ্জ্বল্যে দীপ্তিময়। ৫৯. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৬০. উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কী হতে পারে? ৬১. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৬২. ঐ দুটি বাগান ছাড়াও থাকবে আরো দুটো বাগান। ৬৩. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৬৪. ঘন সবুজ শ্যামল সতেজ বাগান। ৬৫. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৬৬. প্রতিটি বাগানেই উৎসারিত হবে দুটি ঝর্ণাধারা। ৬৭. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৬৮. সেখানেও থাকবে প্রচুর ফলমূল, খেজুর, আনার। ৬৯. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৭০. (বাগানগুলোর) সবকিছুই হবে পরিশুদ্ধ ও মনোহর। ৭১. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৭২. সুসজ্জিত বর্ণিল তাঁবুতে থাকবে পরিশুদ্ধ সমুজ্জ্বল সাথিরা। ৭৩. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৭৪. কোনো জ্বীন বা মানুষ কখনো এদের কাছে আসে নি। ৭৫. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৭৬. তারা সুন্দরতম গালিচায় সবুজ তাকিয়ায় পরম প্রশান্তিতে হেলান দিয়ে বসবে। ৭৭. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৭৮. কত বরকতময় তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহামহিম, মহানুভব!

৫৬. সূরা ওয়াকিয়া

রুকু ৩ ॥ আয়াত ৯৬ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

যখন কেয়ামত হবে, ২-৩. তখন মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলার মতো কেউ থাকবে না। তখন কেউ হবে পতিত, কেউ সমুন্নত।

৪-৬. যখন প্রবল কম্পনে সারা পৃথিবী একসাথে প্রকম্পিত হবে, পাহাড়-পর্বত সব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধূলিকণারূপে চারদিকে ছড়িয়ে যাবে।

৭. আর (মহাবিচারের দিন) তোমাদের তিন ভাগে ভাগ করা হবে। ৮. সত্য-অনুসারীরা থাকবে ডানপাশে। আহা! যারা সত্য অনুসরণ করেছে, আজ কতই না সুখী তারা!

৯. অন্যায় অসত্যে ভরা যাদের জীবন তারা থাকবে বামপাশে। হায়! যারা পাপে ডুবে ছিল, তারা আজ কতই না অসুখী!

১০. আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামীই। (জীবনে তারা বিশ্বাস ও সৎকর্মে অগ্রগামী ছিল।) ১১. তারা সবসময়ই আল্লাহর কাছাকাছি ছিল এবং কাছাকাছি থাকবে। ১২. তারা নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে থাকবে। ১৩-১৪. এদের

অনেকেই আসবে পূর্বসূরিদের মধ্য থেকে। আর কিছু আসবে উত্তরসূরিদের মধ্য থেকে। ১৫-১৬. সুখের স্বর্ণখচিত আসনে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে এরা হেলান দিয়ে বসবে।

১৭-১৮. চিরকিশোররা সুরাহি ও পানপাত্রে প্রবহমান বার্নার অমৃতসম পানীয় নিয়ে তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে।

১৯. এই পানীয়ে তাদের মাথাও ধরবে না, মাতলামিও হবে না (হবে পরিতৃপ্তি)।

২০-২১. ওরা পরিবেশন করবে পছন্দমতো সুস্বাদু ফলমূল আর কাঙ্ক্ষিত পাখির মাংস।

২২-২৩. আর সেখানে তাদের সাথে থাকবে পবিত্র দৃষ্টিসম্পন্ন সাথিরা, বিনুকের ভেতরে সংরক্ষিত মুক্তার ওজ্জ্বল্য নিয়ে। ২৪. এ সবই তাদের সৎকর্মের পুরস্কার।

২৫. সেখানে তারা কোনো বাজে বা পাপকথা শুনবে না।

২৬. শুধু ধ্বনিত অনুরণিত হবে শান্তি! শান্তি!!

২৭. যারা ডানপাশে থাকবে তারাও ভাগ্যবান।

২৮-৩৩. তারা থাকবে এমন জান্নাতে, যেখানে থাকবে কাঁটাহীন কুলগাছ, কাঁদি কাঁদি কলা, দিগন্তবিস্তৃত ছায়া, প্রবহমান বার্নার পানীয়, প্রচুর ফলমূল, যা কখনো শেষ হবে না, যা নাগালের বাইরেও যাবে না।

৩৪-৩৭. উঁচু আসনে তাদের সাথে থাকবে তাদের সাথিরা,

সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করব তাদের, বিকশিত সৌন্দর্যে তারা হবে প্রেমময় অনুগত সমকক্ষ। ৩৮. এ সবকিছুই ডানপাশের সত্যানুসারীদের জন্যে।

॥ রুকু ২ ॥

৩৯. এদের অনেকেই আসবে পূর্বসূরিদের মধ্য থেকে।

৪০. আর অনেকেই আসবে উত্তরসূরিদের মধ্য থেকে।

৪১. কিন্তু যারা অন্যায়ে নিমজ্জিত ছিল, সেই বামপাশের লোকেরা, তারা কতই না দুর্ভাগা! ৪২-৪৪. তারা থাকবে তপ্ত বায়ুপ্রবাহ আর জ্বলন্ত হতাশায়, ফুটন্ত পানি ও কালো ধূম্জালে। সেখানে না থাকবে কোনো শীতল আবহ, না কোনো আরাম।

৪৫. দুনিয়ায় ওরা মত্ত ছিল (ফুটানি ও) ভোগবিলাসে।

৪৬. বার বার লিপ্ত হয়েছে ঘোরতর অন্যায় ও পাপকর্মে।

৪৭. ওরা বলত, দেহ মাটিতে মিশে গেলে শুধু অস্থিপঞ্জর পড়ে থাকবে। এরপর আমাদের ওঠাবে কীভাবে?

৪৮. তাছাড়া আমাদের পূর্বপুরুষরা তো আরো আগেই মাটিতে মিশে গেছে। ওদেরও কি ওঠানো হবে?

৪৯-৫০. হে নবী! ওদের বলো, তোমাদের পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি—সবাইকে নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময়ে সমবেত করা হবে।

৫১-৫৫. অতএব হে সত্য অস্বীকারকারীরা! (নিজের সর্বনাশ তোমরা নিজেরাই করেছ!) এবার বিষাক্ত গাছের ফল খাও। তা দিয়েই তোমাদের পেট ভরাও। তারপর পান করো উত্তপ্ত পানি, পান করো পিপাসার্ত উটের ন্যায়। ৫৬. এভাবেই কেয়ামতের দিন আপ্যায়ন করা হবে বামপাশের লোকদের।

৫৭. হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তবে কেন তোমরা সত্যকে গ্রহণ করবে না? ৫৮-৫৯. তোমরা কি ভেবে দেখেছ বীর্যপাত সম্পর্কে? তোমরা কি তা সৃষ্টি করেছ, না সৃষ্টির উৎস আমি?

৬০-৬১. আমি বিধান দিয়েছি যে, মৃত্যু সবসময় তোমাদের মাঝে অবস্থান করবে। আর তোমাদের অস্তিত্বের প্রকৃতি পরিবর্তন বা তোমাদের জানা নেই, এমন আকৃতিতে তোমাদের সৃষ্টি করা থেকে আমাকে বিরত রাখার শক্তি কারো নেই।

৬২. তোমাদেরকে প্রথম যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে-সম্পর্কে তো তোমরা জানো। তাহলে কেন তোমরা স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করবে না?

৬৩. তোমরা জমিনে যে বীজ বপন করো, সে-সম্পর্কে কি কখনো চিন্তা করেছ? ৬৪. তোমরা কি বীজ অঙ্কুরিত করো, না আমি অঙ্কুরিত করি?

৬৫-৬৭. আমি ইচ্ছা করলে বীজকে তুষে পরিণত করতে পারতাম, তখন তোমরা হা-হুতাশ করে বলতে, ‘আমরা দেনায় পড়ে গেলাম!’, ‘আমাদের সর্বনাশ হলো!’

৬৮. তোমরা যে পানি পান করো, সে-সম্পর্কে কি তোমরা কখনো চিন্তা করেছ? ৬৯. তোমরা কি মেঘমালা থেকে পানি নামিয়ে আনো, না আমি পানিবর্ষণ করি? ৭০. আমি তো ইচ্ছা করলে নোনা বা তেতো পানিবর্ষণ করতে পারি। তাহলে কেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করবে না?

৭১. তোমরা যে আগুন জ্বালো তা নিয়ে কি কখনো ভেবেছ?

৭২. জ্বালানি হিসেবে যে গাছ ব্যবহার করো তা কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি? ৭৩. গাছকে বানিয়েছি আমার মহিমা স্মরণের একটি মাধ্যম এবং পথহারা পথিক ও প্রাণীর বিশ্রামস্থল।

৭৪. অতএব হে নবী! তুমি তোমার প্রতিপালকের মহানামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।

॥ রুকু ৩ ॥

৭৫. সাক্ষী ধাপে ধাপে খণ্ডে খণ্ডে অবতীর্ণ (কোরআন)।

৭৬. এটি অবশ্যই এক মহাসাক্ষ্য, যদি তোমরা চিন্তা করো।
[আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, এটি অবশ্যই মহা-অকাট্য

সাক্ষ্য, ২৩ বছর ধরে ধাপে ধাপে খণ্ডে খণ্ডে নাজিল হলেও এর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য বা অন্তর্বিরোধ নেই ॥

৭৭-৭৯. নিশ্চয়ই এ সম্মানিত কোরআন, যা সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, আর পূতপবিত্ররা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।

৮০. নিঃসন্দেহে কোরআন মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ। ৮১-৮২. এরপরও কি তোমরা এই প্রেরিত বাণীকে উপেক্ষা করবে আর সত্যকেই মিথ্যা বলা তোমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে?

৮৩-৮৭. ‘তোমরা স্রষ্টার নিয়মের অধীন নও’—তোমাদের এই দাবি যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে একজন মানুষের অন্তিম মুহূর্তে অসহায়ের মতো যখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যে, তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন তার প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারো না কেন? অবশ্য তখনো আমি তোমাদের চেয়ে অন্তিম শয়ানে শায়িত ব্যক্তির বেশি কাছে থাকি, কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না।

৮৮-৮৯. (মৃত্যু তোমাদের সবারই নিয়তি) আর মৃত ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হলে তার জন্যে রয়েছে উত্তম আপ্যায়ন ও নেয়ামতে পরিপূর্ণ প্রশান্তিময় জাহ্নাম।

৯০-৯১. আর যদি সে সত্য-অনুসারী ডানদিকের কেউ হয়, তাকে বলা হবে, হে সত্যানুরাগী! তুমি শান্তিতে অবগাহন করো।

৯২-৯৪. আর সে সত্য অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের একজন হলে, তাকে স্বাগত জানানোর জন্যে অপেক্ষা করবে জ্বলন্ত হতাশা আর গনগনে আগুন!

৯৫. নিঃসন্দেহে এই হচ্ছে জীবনের প্রবসত্য। ৯৬. অতএব হে নবী! তুমি তোমার প্রতিপালকের মহানামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।

৬৭. সূরা মূলক

রুকু ২ ॥ আয়াত ৩০ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আল্লাহ মহামহিম। সকল কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব তাঁরই হাতে। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২. তোমাদের মধ্যে সংকর্মে কে অগ্রগামী তা পরীক্ষার জন্যেই তিনি জীবন সৃষ্টি ও মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছেন। (সেইসাথে তোমরা যাতে অনুধাবন করতে পারো) তিনিই মহাপরাক্রমশালী ও সত্যিকারের ক্ষমাশীল।

৩. মহামহিম তিনি একের সাথে অন্যকে সাযুজ্যপূর্ণ করে নভোমণ্ডলকে সাত স্তরে সাজিয়েছেন। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোথাও কোনো অসঙ্গতি দেখতে পাবে না। তাকাও! দেখ! কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি?

৪. নভোমণ্ডলের রহস্য বোঝার জন্যে আবার তাকাও, বার বার তাকাও, যতবার তাকাবে ততবারই রহস্যভেদ করতে না পেরে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে।

৫-৬. আমি নিকটবর্তী নভোমণ্ডলকে সুশোভিত করেছি আলোকোজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দিয়ে। এগুলোতে রয়েছে শয়তানি উদ্যোগ ব্যর্থ করার উপকরণ আর অন্যাযকারীদের

জন্যে প্রস্তুত রেখেছি প্রজ্বলিত আগুনের শাস্তি। আসলে যারাই প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে, তাদের সবার জন্যেই অপেক্ষা করছে জাহান্নামের আগুন। হায়! পরিণতি হিসেবে এটা কতই না নিকৃষ্ট!

৭-৮. যখন ওদেরকে সেখানে ফেলা হবে, তখন ওরা জাহান্নামের ভয়াবহ গর্জন শুনতে পাবে। জাহান্নাম ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইবে। যখনই ওর মধ্যে পাপীদের কোনো নতুন দলকে ফেলা হবে, তখন জাহান্নামের প্রহরীরা ওদের জিজ্ঞেস করবে, ‘তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসে নি?’

৯-১০. ওরা বলবে, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল। কিন্তু আমরা তাদের মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেছি। আমরা বলেছিলাম, ‘আল্লাহ কখনো কোনো বাণী নাজিল করেন নি, তোমরা স্বঘোষিত সতর্ককারীরা মহাবিপ্রান্তিতে নিমজ্জিত।’ হায়! যদি আমরা তাদের কথা শুনতাম অথবা কমপক্ষে আমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া থেকে রক্ষা পেতাম।

১১. এভাবে ওরা নিজেরাই নিজেদের অপরাধের বিষয়টি উপলব্ধি করবে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। জাহান্নামের আগুনই হচ্ছে তখন ওদের নিয়তি।

১২. অপরদিকে প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমান না হওয়া সত্ত্বেও যারা আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থেকেছে ও তাঁর আনুগত্য করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১৩-১৪. তোমরা গোপনে কানে কানে বলো বা প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে বলো, আল্লাহর কাছে সবই সমান। তিনি তো অন্তর্যামী। আশ্চর্য! যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তোমার মনের ভেদ জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী প্রজ্ঞাময়, সব বিষয়ে অবগত।

॥ রুকু ২ ॥

১৫. আল্লাহ তোমাদের জন্যে জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ো। তাঁর দেয়া জীবনোপকরণ থেকে আহার করো। কিন্তু সবসময় মনে রেখো, পুনরুত্থানের পর তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

১৬-১৭. তোমরা কীভাবে নিশ্চিত হলে যে, আল্লাহ সহসা ভূমিকম্প সৃষ্টি করে তোমাদেরসহ জমিনকে ধসিয়ে দেবেন না? তোমরা কীভাবে নিশ্চিত হলে যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর প্রলয়ঙ্করী কঙ্কর-ঝড় বইয়ে দেবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সতর্কবাণী কত সত্য ছিল!

১৮. অতীতে যারা পৃথিবীতে বসবাস করে গেছে, ওদের অনেকেই আমার সতর্কবাণীকে মিথ্যা মনে করেছিল, ওদের জন্যে আমার শাস্তিও ছিল কঠিন।

১৯. মানুষ কি উড়ন্ত পাখিদের লক্ষ করে না, কী চমৎকারভাবে ওরা ডানা মেলে ও ডানা গুটায়! দয়াময় আল্লাহই ওদের উড়ন্ত রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক-দ্রষ্টা ও সবকিছুর সংরক্ষক।

২০. দয়াময় আল্লাহ ছাড়া আর কে তোমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে? যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে, তারা আসলে আত্মপ্রবঞ্চনায় নিমজ্জিত।

২১. আল্লাহ যদি কারো রিজিক বা জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের রিজিক দিতে পারবে? কিন্তু ওরা সত্য অস্বীকারে অটল রয়েছে ও আল্লাহর বাণীর অবাধ্যতায় একগুঁয়েমি করেই চলছে।

২২. একটু ভেবে দেখ, একজন ঘাড় নিচু করে পা বরাবর মাটিতে চোখ রেখে হাঁটছে আর একজন সোজা হয়ে সামনে দৃষ্টি মেলে মুক্তমনে পথ চলছে, এদের মধ্যে কে সাফল্যের সরলপথের সন্ধান পাবে?

২৩. হে নবী! ওদের বলো, আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, সেইসাথে দিয়েছেন বিচারবুদ্ধি, অন্তঃকরণ। অথচ তোমাদের গুরুরিয়া বা কৃতজ্ঞতার প্রকাশ খুবই কম।

২৪. বলো, আল্লাহই জমিনে তোমাদের বংশবিস্তার ঘটিয়েছেন আবার কেয়ামতে সবাইকে তাঁর নিকট সমবেত করবেন।

২৫. আর ওরা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের বলো প্রতিশ্রুত কেয়ামত কবে হবে?

২৬. হে নবী! বলো, ‘একমাত্র আল্লাহ এ বিষয়ে জানেন। আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।’

২৭. শেষ পর্যন্ত যখন ওরা নির্মম সত্যের মুখোমুখি হবে, তখন সত্য অস্বীকারকারীদের চেহারা হয়ে যাবে মলিন বিমর্ষ আতঙ্কগ্রস্ত তখন ওদের বলা হবে, ‘এবার দেখ! তোমরা যা দেখতে চেয়েছিলে।’

২৮. হে নবী! বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ? আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করতে পারেন বা আমাদের প্রতি দয়াও করতে পারেন। কিন্তু হে সত্য অস্বীকারকারীরা! পরকালীন কঠিন শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করার কেউ আছে কি?

২৯. (হে নবী! ওদের) বলো, আল্লাহ পরম দয়াময়। আমরা তাঁর ওপরই বিশ্বাস রাখি এবং তাঁর ওপরই নির্ভর করি। সময় হলেই তোমরা জানতে পারবে, কে সুস্পষ্ট বিদ্রোহিতা নিমজ্জিত।

৩০. হে নবী! সত্য অস্বীকারকারীদের জিজ্ঞেস করো,
তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি হঠাৎ করে ভূগর্ভে পানির স্তর
নেমে গিয়ে তা তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়,
আল্লাহ ছাড়া আর কে তোমাদের জন্যে নতুন করে প্রবহমান
পানির ব্যবস্থা করতে পারবে?

• • •

আয়াতুল কুরসি

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি শাস্ত্র চিরঞ্জীব।
বিশ্বপ্রকৃতির সর্বসত্তার ধারক। তিনি তন্দ্রা-নিদ্রাহীন
সদাসজাগ। মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক। তাঁর
সদয় অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করার সাধ্য
কারো নেই। দৃশ্যমান বা অদৃশ্য, অতীত বা ভবিষ্যৎ—সৃষ্টির
সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি যতটুকু জানাবেন, এর বাইরে
তাঁর জ্ঞানের সীমানা সম্পর্কে ধারণা করা কারো পক্ষেই
সম্ভব নয়। তাঁর আসন, তাঁর কর্তৃত্ব পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের
সর্বত্র বিস্তৃত। আর তা সংরক্ষণে তিনি অক্লান্ত। তিনি
সর্বোচ্চ সুমহান। —বাকারা : ২৫৫

প্রিয় পাঠক,

‘আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী’ কোরআনের বাংলা অনুবাদ নয়। আল্লাহতে সমর্পিত একজন মানুষ হিসেবে কোরআনের বাণীর যে অন্তর্নিহিত অর্থ আমি উপলব্ধি করেছি, তা-ই আন্তরিকতার সাথে মায়ের ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে মর্মার্থ অনুধাবনে, প্রকাশে বা মুদ্রণে কোথাও কোনো ভুল হয়ে থাকলে আল্লাহ গাফুরুর রাহীমের কাছে করজোড়ে অবনতমস্তকে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সকল ভুলভ্রান্তি মুক্ত করে সিরাতুল মুস্তাকিম, সাফল্যের সরলপথে পরিচালিত করুন।

প্রিয় পাঠক,

‘আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী’ সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

যোগ ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক

শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

E-mail : info@quantummethod.org.bd

